দাম : যোলো টাকা

স্বস্তিকা

শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন

— পৃঃ ৬

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রী রাজপথে

— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ৪ আগস্ট, ২০২৫।। ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

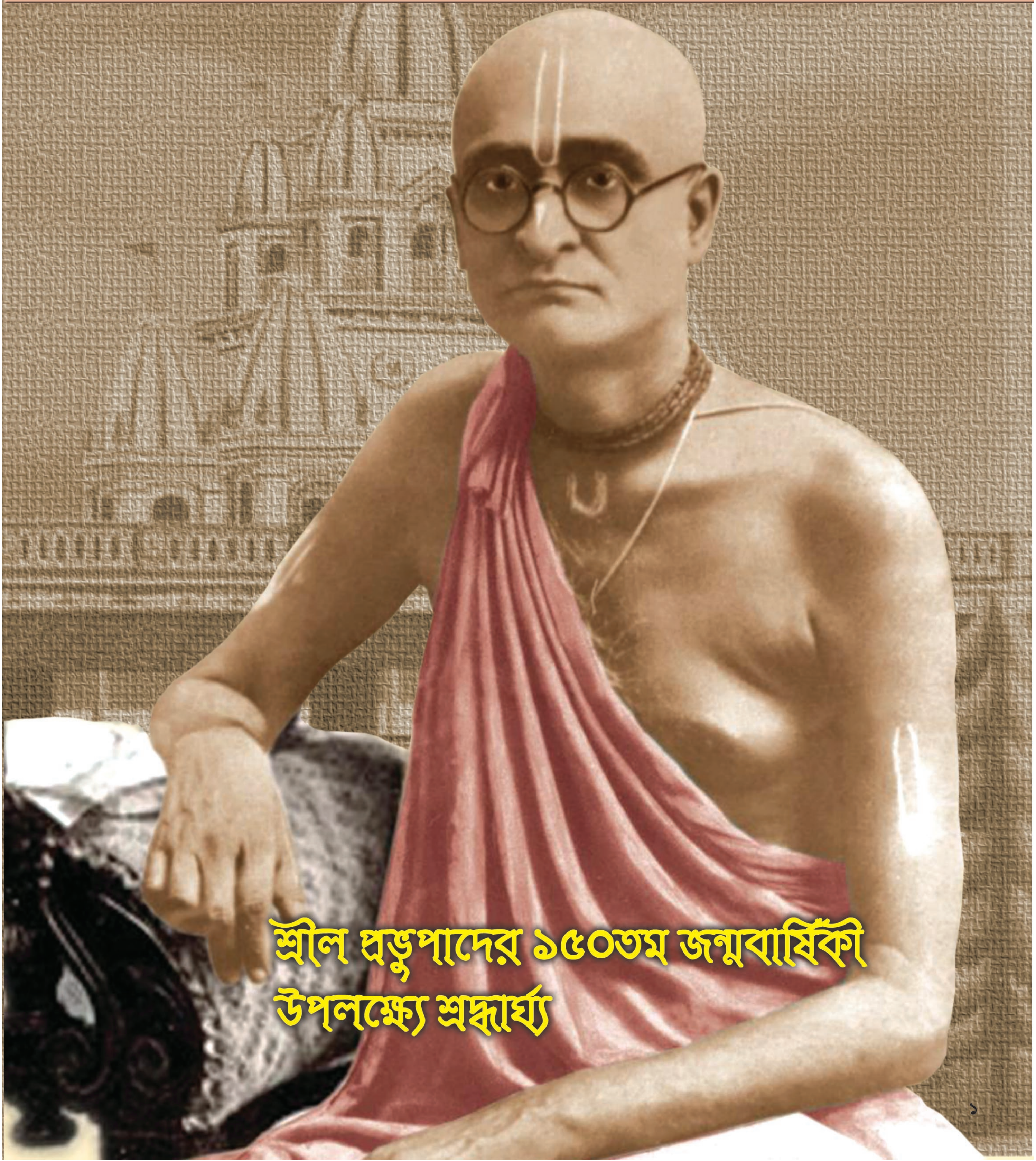

শ্রীল প্রভুপাদের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৪ আগস্ট - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

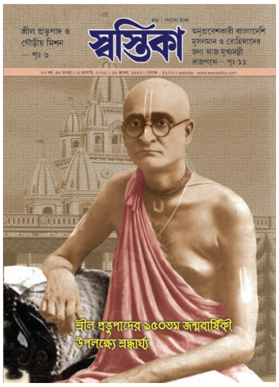

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন ◻ শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ◻ ৬

ভোটার তালিকা সংশোধন বাঙ্গালি আবেগের আড়ালে আসল উদ্দেশ্য ◻ অখিলেশ বাজপেয়ী ◻ ৯

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রী রাজপথে ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

ভোটার তালিকা সংশোধনে তৃণমূলের ভয় কেন! সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অবৈধ ভোটারদের কোনোরকম ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয় ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৪

বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট গেয়ে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি রক্ষার কৌশল মমতা ব্যানার্জির ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৬

বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ছিলেন অনুপ্রবেশের বিপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশের পক্ষে
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৯

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (১৮৭৪-১৯৩৭) ◻ ২৩

বোল ব্যোম : কাঁওর নিয়ে বৈদ্যনাথে
◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

রাখিবন্ধন ও জাতীয় সংহতি ◻ অতুল কুমার বিশ্বাস ◻ ৩৪

আপন প্রতিভা বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৫

বাঙ্গালি ভাবাবেগ উসকে দিয়ে আদতে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে চাইছেন মমতা
◻ প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৮

'বাঙ্গালি-প্রেম' মমতা ব্যানার্জির দেউলিয়া রাজনীতির নয়া ন্যারেটিভ
◻ সুজিত রায় ◻ ৪৩

প্রতিটি ভারতবাসীর প্রতিটি পরামর্শ শুনতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৪৫

বাঙ্গালির সত্য, বাঙ্গালির মিথ্যা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৪৮

কীসের ভয়ে বাঙ্গালি উন্মাদনার বিষ ছড়াচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি?

জুজু যদি ধরে ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৪৯

ডেমোগ্রাফিক ওয়ারফেয়ার : এক নীরব যুদ্ধ চলছে পশ্চিমবঙ্গে
◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৬-২৮** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

প্রকাশিত হবে
১১ আগস্ট
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১১ আগস্ট
২০২৫

১৫ আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ভারতবাসীর নিকট এটি যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের দিন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদও করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক বছর থেকে ১৫ আগস্ট বিভাজন বিভীষিকা দিবস রূপে পালন করছে। এই বছরের ১৫ আগস্ট হলো ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশকারী ও নাগরিক এক নহে

অতীব দুঃখের বিষয় যে ভারতের স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোনোকালেই শত্রু-মিত্র ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈদেশিক শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। অতপর দেশ ও জাতির সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন, অবশেষে নিজেও সেই শত্রুর হস্তে বিনাশ হইয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে অম্ভী, জয়চাঁদ, মানসিংহ ও যোগেন মণ্ডলদের নাম কলঙ্কিত নায়ক হিসাবেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদেরই স্বার্থবুদ্ধির কারণে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদেরই তোষণনীতির কারণে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই দেশের স্বার্থান্বেষী ভোটভিখারি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোনোপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। দেশবিভাগের ন্যায় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও তথাকথিত নেতৃবৃন্দ সেই অনুপ্রবেশকারীদেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করিয়া দিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে তাহারা অনুপ্রবেশের ন্যায় একটি ভয়াবহ বিষয়কে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করেন নাই। রাজনীতিশাস্ত্রের ছাত্রগণ অবগত আছেন যে, অনুপ্রবেশ শব্দটি একটি সামরিক পরিভাষা। কোনো দুর্গের প্রহরীদিগকে উৎকোচের মাধ্যমে বশীভূত করিয়া অথবা দুর্গের প্রহরীদিগের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া গুপ্তপথে অতর্কিতে বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বিনা যুদ্ধে দুর্গ দখল করিয়া লওয়াই অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য। সম্মুখসমরে জয় যখন অসম্ভব তখনই শত্রুপক্ষ অনুপ্রবেশ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম প্রবর্তন হইবার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই আরব মরুদস্যুর দল বিশ্বের এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করিয়া লয়। সেই সমস্ত দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত জীবনধারাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। সপ্তম শতকেই তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। তরবারির সম্মুখে এবং প্রলোভনের দ্বারা তাহারা বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যাচার করিয়াও সমগ্র ভারতবর্ষকে পদানত করিতে পারে নাই। এই দেশের বীর সন্তানগণ ইসলামকে প্রতিহত করিতে পারিলেও সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলস্বরূপ এবং কতিপয় অদূরদর্শী নেতার কারণে ১৯৪৭ সালে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে।

দেশ বিভাজনের ন্যায় ঐতিহাসিক ভুল হইতেও অদূরদর্শী ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অদ্যাবধি তাহারা অনুপ্রবেশকারীদের মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদিগকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ন্যায় মহাপাপ কার্যটি শুরু করিয়াছে এই রাজ্যে সিপিআইএম নামক বিদেশি মদতপুষ্ট দলটির নেতৃবৃন্দ। তাহারা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাহাদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড পর্যন্ত প্রদান করিয়া এই দেশে তাহাদের পাকাপাকি থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারাই কোটি কোটি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িতে উৎসাহিত করিয়াছে। এই কমিউনিস্টরাই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সীমান্তকে অবাধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের এক নেতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিবার সময়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'সীমান্ত আবার কী? এপারেও বাঙ্গালি ওপারেও বাঙ্গালি, যাওয়া-আসা চলিতেই পারে।' চৌত্রিশ বৎসরের শাসনে এই কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিকে অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য করিয়া তুলিয়াছে। উল্লেখ করিবার মতো বিষয় হইল, সেই সময় রাজ্যের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিলেন। তিনি দাবি তুলিয়াছিলেন, অনুপ্রবেশকারীদের বাদ না দিয়া নির্বাচন নহে । ক্ষমতার কী ভয়ানক লোভ যে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ মুখ্যমন্ত্রী হইয়া অনুপ্রবেশকারীদের মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন। এই অনুপ্রবেশকারীরাই তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। আজ ভারতের নির্বাচন কমিশন যখন নির্বাচন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ করিবার জন্য ভোটার তালিকা হইতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিবার প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালি বিতাড়ন চলিতেছে বলিয়া নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তোপ দাগিতেছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থে অনুপ্রবেশকারী এবং প্রকৃত নাগরিকদের এক করিয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে বহিরাগত শত্রুদের জন্যই একবার দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। আশির দশক হইতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া আসিতেছে। এখনো বাঙ্গালি সচেতন না হইলে পশ্চিমবঙ্গ যে শীঘ্রই শত্রু কবলিত হইতে চলিয়াছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

সুভাষিতম্

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্বন্তি সাধকাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিম্ উপেক্ষতে।।

ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য সাধকগণ বৃথাই চিন্তা করেন। যে ভগবান সমগ্র বিশ্বকে পালন পোষণ করেন তিনি কি তাঁর ভক্তদের উপেক্ষা করতে পারেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ— ‘পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম।।’ ‘জগতে মায়িক নামই সর্বত্র চলছে, বৈকুণ্ঠনাম প্রচারিত হোক। পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে প্রতিনিধি থাকেন থাকুন, মন্দির করা হোক, ঠাকুর থাকুন কিন্তু letter class-higher class যাঁরা, তাঁদের প্রচারকার্য বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট— এই কথা ইংল্যান্ডে প্রচারক শিষ্যের উদ্দেশে বলেন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।’

আজ সারা পৃথিবীতে গৈরিকবসন, শিখাসূত্রধারী যত বৈষ্ণব আছেন সকলের গুরু হলেন এই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বেলা ৩টার সময়, পুরীর ডিএম পরবর্তীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কালেক্টর অফিসার শ্রী কেদারনাথ দত্তের পুত্ররূপে মা ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্ম নিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমন্দিরের কাছেই ‘নারায়ণছাতা’ ছিল বাসগৃহ। ছ’মাস পরে রথযাত্রা করে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কিন্তু নিজের এই ছোট্ট ভক্তকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে যমসদনে নচিকেতার মতোই তিনদিন অপেক্ষা করলেন দ্বারে। মা কোলে নিয়ে রথে উঠে ছেলেকে জগন্নাথের চরণপ্রান্তে শুইয়ে দিতে ছেলে দু’হাতে জগন্নাথকে ধরে আপনবোধে হাসতে লাগলো। আর জগন্নাথ তাঁর আশীর্বাদরূপে প্রসাদী মালা ছিঁড়ে ফেললেন শিশুর মাথায়। ঠিক তারপরই রথ চলতে লাগলো। এইভাবেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ পথ চলা শুরু করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন

শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর গোস্বামীবর্গ তাঁর প্রেম শুদ্ধভক্তির মতাদর্শ উত্তর-পূর্ব ভারতে বহুলপ্রভাবে প্রচার করলেও কালের গতিতে তা কিছুজনের মনোধর্মের মিশ্রণে বিকৃত হয়ে ১৩টি অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। শ্রী কেদারনাথ দত্ত মহাশয় অবলুপ্ত প্রায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ষড়গোস্বামী শুদ্ধভক্তি ধর্মের কিছু গ্রন্থের খোঁজ পেলেন ওড়িশার রাজপরিবারের গ্রন্থাগারে। এগুলো পড়ে তিনি বুঝলেন সমাজের নীচু শ্রেণীর কিছু লোক যে নিতাই-গৌর প্রবর্তিত ধর্মের ধ্বজা উড়িয়েছে তা সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির ধারা নয়। তিনি খুঁজে খুঁজে যেখানে যত শুদ্ধভক্তিধারার পালক বৈষ্ণব রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন এবং সমাজে শিক্ষিত জনসভায় এই শুদ্ধভক্তি মতের আলোচনা করে মহাপ্রভুর ভক্তিধারাকে পুনরায় আবাহনের চেষ্টা করে চললেন। গোস্বামী রচিত গ্রন্থ উদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা ভাষায় অনুবাদ, কোথাও টীকা-টিপ্পনীর সংযোজন ইত্যাদির করে ছাপানোর জন্য নিজের বাড়িতে ছাপাখানা খুললেন, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা বের করতে লাগলেন। ঠিক এই পরিমণ্ডলে বড়ো হলেন অসামান্য শ্রুতিধর ও স্মৃতিশক্তিশালী শ্রীল প্রভুপাদ। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ পড়ে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবার আদেশে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয় ধারায় প্রবেশ করে তীর্থপর্যটন, শতকোটি মহামন্ত্র গ্রহণ ব্রত সমাপনান্তে শুরু করলেন গৌরলীলা স্থান, গৌরপার্ষদের লীলাস্থান পর্যটন এবং সেখানে শুদ্ধভক্তির পুনঃপ্রচার।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বালিঘাইতে আয়োজিত স্মার্তব্রাহ্মণদের সভায় অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী, বুদ্ধিদীপ্ত, বাগ্মী, তেজস্বী, বিনম্র তরুণের দর্শন এবং শাস্ত্রযুক্তিতে তুখোড় ভাষণে মুগ্ধ জনসমুদ্র তাঁর পা-ধোওয়া জল চাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা,

তর্ক-বিতর্কে তার মতের প্রাধান্য স্থাপিত হতে লাগল। শিক্ষিত সমাজ তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য তাঁর দর্শনপ্রার্থী হতে লাগল। বিভিন্ন রাজা- মহারাজা, রায়বাহাদুররা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা যেমন করলেন, তেমনি কেউ কেউ তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করে ফেললেন, তা সে ত্রিপুরাধীশই হোন আর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই হোন। শ্রীল প্রভুপাদ কলকাতার অ্যালবার্ট হলে যেমন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে বক্তব্য রাখেন তেমনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য সকলকে গৌড়ীয় দর্শনের সিদ্ধান্তের অনুরণনে বিস্ময়ে হতবাক করে নিজ পদপ্রান্তে নত করিয়ে ফেলেন অনায়াসে। এরই মধ্যে নিরলস পরিশ্রমে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ভাগবত যন্ত্রালয়' স্থাপন করে স্বরচিত 'অনুভাষ্য'-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের টীকা-সহ গীতা ও গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত বিবৃতি-সহ) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুরু করেন। কটকেও ছাপাখানা স্থাপন করে উৎকল ভাষায় পরমার্থী, এছাড়াও দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পাক্ষিক গৌড়ীয় পত্রিকা ছাড়াও ৬টি ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যা বৈকুণ্ঠদূতের মতো জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হয়, তেমনি সমাজে শুদ্ধভক্তির ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং বিরোধী মিথ্যা তার্কিকদের শাস্ত্রযুক্তি জিভ কাটে। বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে কলির তমো অর্থাৎ তর্ক-কলহ-বিনাশে দক্ষ প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী-বিমলপ্রবাহে-ভবার্ণবে পতিত জীবকুলের তপ্তপ্রাণ শীতল করেন। তাঁর

শ্রী গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ পূর্তি সমারোহে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।

এক গুণগ্রাহী বলেন—

হানি' সুসিদ্ধান্ত উপধর্ম খান খান
সজ্জনের বাড়ালে উল্লাস।।
স্মার্তমত জলধর শুদ্ধভক্তি রবিকর
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনেতে সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে।।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের আচারিত ও প্রচারিত বৈদিক শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থনীভূত শুদ্ধভক্তিকে জগতের বুকে চিরজাগরুক রাখতে স্থাপন করলেন মঠ ও মিশন। এই মঠবাসীরা হলেন দৈববর্ণাশ্রম যাজী এবং শ্রীমহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁদের আচরণ সর্বদা তাঁদের ঢাল হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রচারক হলেন শুদ্ধভক্তির তলোয়ার নিয়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর পিয়ন হয়ে জগতবাসীর দ্বারে দ্বারে আজও তারা উপস্থিত। ভগবানের কীর্তন যেমন করতালের সঙ্গে মৃদঙ্গ ধ্বনিতে রসাল হয়ে উঠে, তেমনি গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিযাজী সেবকরা নিরন্তর অনলসভাবে মহাপ্রভুর বাণী কীর্তনে জীবন্ত-মৃদঙ্গ হয়ে বিশ্ববাসীকে কৃষ্ণকীর্তনের রসিক করে তুলেছেন। তারা প্রত্যেকে নিষ্কাম হয়ে নিরাগবক্তায় পরিণত হয়েছেন, ফলে জীব-মঙ্গলেও

গো-সেবা ও সংরক্ষণ

সমর্থ হয়েছেন। সরাগবক্তা জনরঞ্জন করতে গিয়ে মঙ্গল সাধনে বিফল হন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'বড়ো দরিদ্র জীব আমরা, দরিদ্র নারায়ণ নই। আমাদের এই দরিদ্রতা কমে যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।' —এটাই আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। নয়তো পঞ্চরাত্রের মূল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্য বিচার প্রবল করে ফেলি, মস্ত বড়ো কর্মবীর হয়ে পড়তে চাই।'

শ্রীল প্রভুপাদ ইংল্যান্ড, জার্মানি, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের প্রেরিত প্রচারকদের উদ্দেশে বলেন, দাম্ভিক লোক কখনো প্রচারকার্য করতে পারে না। দাম্ভিক প্রচারকের সাজ নিয়ে 'আমিই প্রচারক'— এই অভিমান করে, বাস্তব সত্য তার কাছে আত্মপ্রকাশ করে না, সুতরাং তার দ্বারা জগতের কোনো বাস্তব মঙ্গল বিহিত হতে পারে না। কেউ অমেধ্যভোজী হবে, কেউ স্বদেশ প্রীতির নামে স্ব-পর ভেদদর্শী হয়ে মাৎসর্যানলে দগ্ধীভূত হবে, কেউ-বা ভক্তির ভান করবে— এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের কী সন্ধান রাখবে? এরা তো হাস্যরসের পাত্র। তথাকথিত তীর্থবাস, জাত গোঁসাইগিরি, ভাগবত পড়ে পেট চালানোর নামই লোক 'ভক্তি' বলে জানলো। কাকে বলে শুদ্ধ ভাগবতানুশীলন। বিদ্ধা বা মিশ্রাভক্তি, অবিদ্ধাভক্তি বা শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধান লোক করুক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার করুন।' এই জন্য প্রভুপাদ ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে শাখা মঠ স্থাপন করলেন যা জগতে কেবল কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞান দানে জীবের মঙ্গল সাধন করবে। তিনি তাঁর ৬২ বছরের জীবনদশায় দেশে-বিদেশে ৬৪টি মঠ স্থাপন করেন। আর অধোক্ষজ তত্ত্বে নিপুণ তৈরি করেন প্রতিটি শিষ্যকে, যারা আজও সারা বিশ্বে দরিদ্র জীবকে কৃষ্ণপ্রেমধন দানে সুখী করে, ধনী করে চলেছেন। প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ তাঁর অসীমগুণে গুণী হয়ে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নামে তাঁর প্রারব্ধকাজের পতাকা বহন করে নিয়ে চলেছেন। কেউ গৌড়ীয় মঠ, কেউ চৈতন্য মঠ, কেউ গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, তো কেউ ইসকন্ ইত্যাদি নাম নিয়ে সেই 'পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্'-এর ধ্বজা বহন করছেন বহু শাখা-প্রশাখায়।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের (১৮৭৪-২০২৪) সার্দ্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে তিনবছর ব্যাপী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশে তথা লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে প্রচার, সেমিনার, প্রদর্শনী, ধর্মসভা, বিশ্ববৈষ্ণব সম্মেলন, উত্তর ও দক্ষিণ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার শুভসূচনা হয়েছিল ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের উপস্থিতিতে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম পুরীতে। ভারত সরকার ও ইউনেস্কো শ্রীল প্রভুপাদের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী বছর (২০২৪-২০২৫)-কে 'সার্দ্ধশততমবার্ষিকী আবির্ভাব স্মরণ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষ্যে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, ভারত মণ্ডপম, নিউ দিল্লিতে 'সার্দ্ধশততমবার্ষিকী আবির্ভাব স্মরণ বর্ষ' উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীল প্রভুপাদের নামাঙ্কিত স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট উন্মোচন করেছেন। এই মহামহোৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শুক্রবার কলকাতা মহানগরীস্থিত 'সায়েন্স সিটি মেইন অডিটোরিয়াম'-এ ভারতবর্ষের মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজগদীপ ধনকর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় শ্রীল প্রভুপাদের ১৫১তম শুভ আবির্ভাব স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় মিশন এবং ওড়িশার সমস্ত গৌড়ীয় মঠের আয়োজনে আগামী ১৩-১৪ আগস্ট, ২০২৫ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের গৌরবময় উপস্থিতিতে ওড়িশা প্রদেশের কটকে জওহরলাল নেহরু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুদিন ব্যাপী 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও গৌড়ীয় মিশন উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের স্মরণে মিশনের বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁর নামে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। যথা—

১। শ্রীল প্রভুপাদ মিনি কনভেনশনাল সেন্টার, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ। ২। শ্রীল প্রভুপাদ সোশিও-কালচারাল রিসোর্স সেন্টার, বাগবাজার, কলাকতা, পশ্চিমবঙ্গ। ৩। শ্রীল প্রভুপাদ মেমোরিয়াল হল, কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা। ৪। শ্রীল প্রভুপাদ সিনিয়ার সিটিজেন স্প্রিচুয়াল থেরাপি সেন্টার, পুরী, ওড়িশা। ৫। শ্রীল প্রভুপাদ পরাবিদ্যাপীঠ ও বৈদিক এডুকেশন সেন্টার, বালেশ্বর, ওড়িশা।

(লেখক গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য)

অতিথি কলম

অখিলেশ বাজপেয়ী

ভোটার তালিকা সংশোধন

বাঙ্গালি আবেগের আড়ালে আসল উদ্দেশ্য

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার বিস্তৃত সংশোধনের ক্ষেত্রে কী এমন সিদ্ধান্ত নিল যে বিপক্ষ দলগুলির মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত বিরোধীরা মাঠে নেমে পড়েছেন। মমতা ব্যানার্জি হোক বা আসাদুদ্দিন ওয়েসি, কংগ্রেস নেতা হোক বা আরজেডি কিংবা আম আদমি পার্টি সকলেরই নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি রয়েছেন। তারা সকলেই কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে এনআরসি অর্থাৎ জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের একটা কৌশল বলে মনে করছে এবং কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে 'গরিব মুসলমানদের ভোটাধিকার হরণের ষড়যন্ত্র' বলে বর্ণনা করছেন।

যদিও নির্বাচন কমিশন বার বার স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, তাদের এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা এবং ভোটার সূচিকে অধিকাধিক ক্রটিমুক্ত ও স্বচ্ছ করে তোলা। কিন্তু বিপক্ষ নেতারা কমিশনের কোনোরকম যুক্তি শুনতে বা বুঝতে রাজি নন, যদিও এই এরাই বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ভোটার তালিকাতে গণ্ডগোলের অভিযোগ করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, ভোটার তালিকা সংশোধন করতে কমিশন যদি কোনো অভিযান চালায় তাতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়, বরং এ তো কমিশনের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। আর কমিশন যে ভোটার তালিকা নিয়ে সংশোধন প্রথমবার করছে, তাও তো নয়। এই প্রক্রিয়া সংবিধান স্বীকৃত ব্যবস্থার অভিন্ন অঙ্গ এবং নিরন্তর প্রক্রিয়া। দেশের সবচেয়ে পুরনো দল কংগ্রেসের শাসনকালেও বহু বার এই ধরনের সংশোধন হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, দেশের ভোটার তালিকা সংশোধন করা কেন উচিত নয়? বস্তুত, বিপক্ষ দলগুলি এর কোন দিকটা অনুচিত বলে মনে করছে, যার কারণে এত চেঁচামেচি চলছে আর নেতারা তেলে-বেগুনে জ্বলছেন? একসময় এদেরই নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ভোটার তালিকা নিয়ে বড়ো রকমের গণ্ডগোলের অভিযোগ করেছিলেন। কংগ্রেস তো মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে হরিয়াণা পর্যন্ত হারের কারণ হিসেবে ভোটার তালিকাকেই দায়ী করেছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা লোকসভার নেতা রাহুল গান্ধী তো ভোটার তালিকাকে ঠিকঠাক করতে শুধু ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেছেন। এত সবের পর যখন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সেই কাজটাই করতে যাচ্ছে তখন এত বিরোধিতা কেন? এর একটাই কারণ চোখে পড়ে, বিরোধী দলগুলি এর ফলে নিজেদের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে।

নির্বাচন কমিশন সময়ে সময়ে ভোটার তালিকার সংশোধন করে থাকে। নির্বাচন, তা সে পঞ্চায়েত বা স্থানীয় স্তরে হোক বা বিধানসভা, লোকসভা বা কোনো সাংগঠনিক স্তরেই হোক না কেন, তার আগে পূর্ববর্তী ভোটার তালিকাকে ঠিকঠাক করা নিয়ামক প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যক শর্ত। কখনও তা সংক্ষিপ্ত আকারে হয়ে থাকে আবার কখনও সুবিস্তৃত, কখনও আংশিক আর কখনও অত্যন্ত গভীর।

সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা ঠিকঠাক করতে নিযুক্ত কর্মচারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান করে তা ঠিক করেন। এই সংশোধনের মাধ্যমে একপ্রকার নতুন ভোটার তালিকা তৈরি হয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন সেখানকার ভোটার তালিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর সঙ্গে আগামীতে এই প্রক্রিয়াকে সারা দেশে জারি করতে ২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়। এর জন্য ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করা হয়েছে, কেননা এর আগে ২০০৩ সালেই ভোটার তালিকা সংশোধন হয়।

সংশোধনের জন্য কমিশন নিশ্চিত করে যে, যে ব্যক্তি ২০০৩ সালের পর ভোটার হয়েছে, তাকে তার জন্মের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। যার কাছে জন্মের প্রমাণপত্র নেই তাকে জানাতে হবে ২০০৩ সালের আগে তার বাবার নাম ভোটার তালিকার মধ্যে ছিল কিনা। আর যদি ২০০৩-এর আগের সূচিতে তার বাবার নাম থেকে থাকে তবে তার নাম তালিকাভুক্ত করা হবে। কিন্তু যার বাবার নাম তালিকাভুক্ত ছিল না তাকে ভোটার করা হবে না। আর কারও নাম ভোটার তালিকায় থাকার পরেও সন্দেহজনক মনে হয়, তবে তার ব্যাপারে তদন্ত হবে। তদন্তে যদি সে ব্যক্তি নিজের নাগরিকত্বের সপক্ষে প্রমাণ দিতে না পারে তবে তার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত করা হবে। ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণে ব্যর্থ সমস্ত কাগজ ও পরিচয়পত্র বাতিল করা হবে এবং তার প্রকৃত দেশের খোঁজ নিয়ে তাকে সে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। কমিশনের এই নির্দেশের কারণেই বিপক্ষে এত হইচই শুরু হয়েছে। এতে তাদের সমস্ত রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তন হতে দেখতে পাচ্ছে। এই বিষয়টা আর চাপা থাকছে না যে, বড়ো সংখ্যায় বাংলাদেশ, মায়ানমার ও পাকিস্তানের মুসলমান অনুপ্রবেশ করে ভারতে চলে এসেছে, যারা প্রকৃতপক্ষে দেশের নাগরিকদের অধিকার ও সম্পদে ভাগ বসাতে শুরু করে। তার সঙ্গে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপরও চাপ সৃষ্টি করছে। এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও শুধুমাত্র বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

অনুমান করা যায় যে, এর সঙ্গে মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমান বা পাকিস্তান থেকে পাসপোর্ট, ভিসা নিয়ে এসে বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে থাকা মুসলমানদের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। এমন অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে, আবার কোনো কোনো রাজ্যে স্থানীয় সরকারের অনুগ্রহে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সব বানিয়ে ফেলেছে। তার ফলে, দেশের বহু রাজ্যে এবং বহু জেলায় জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যানে

বড়ো ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে এবং মুসলমান জনসংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বহু গুণ বেড়ে গেছে। তার ফলে বহু জেলার জনবিন্যাসের সংখ্যার চরিত্রই পালটে গেছে।

বস্তুত কম-বেশি পুরো দেশেই এই অনুপ্রবেশের কারণে বা জনসংখ্যাগত তারতম্যের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু রাজ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বহু জেলা অনুপ্রবেশের কারণে প্রভাবিত। বিগত কয়েক মাসের ধরে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে এর বিভিন্ন ঘটনা সামনে উঠে আসছে, যেখানে কিছু লোক প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে অন্য দেশের নাগরিক হওয়ার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভোটার হওয়ারও দাবি করে এবং তারা বলে যে তারা বহুবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। এমন স্বীকারোক্তিও প্রকাশ্যে দেখা গেছে, যেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভারত ছেড়ে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই। এর থেকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে। অন্য কোনো দেশের নাগরিক অথচ ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে, কথাটা শুনতেই অবাক লাগে। এমতাবস্থায় যদি কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের ফলে অনুপ্রবেশ রোধ হয়, সেক্ষেত্রে বিপক্ষের প্রশংসা করার পরিবর্তে হইচই করা এবং তাতে আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে এরফলে বিপক্ষের ভোট ভাণ্ডারে টান পড়ছে।

আসলে দেশের সংবিধান ও আইন অন্য কোনো দেশের নাগরিককে ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অভিন্ন অঙ্গ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয় না। সেক্ষেত্রে এ ধরনের লোককে ভোটার তালিকা থেকে বের করতে এবং দেশের বৈধ নাগরিকদের এতে নিজের নাম যুক্ত করার সুযোগ দিয়ে একে সুব্যবস্থিত করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে তাতে আপত্তিজনক কী আছে? কোনো বিদেশির কাছে দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কীভাবে থাকতে পারে?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক এপি তিওয়ারী নির্বাচনের সংখ্যাত্মক তথ্য এবং দেশের রাজনৈতিক পরিদৃশ্যের বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতার কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ বিরোধী দল দুর্ভাগ্যবশত এই অনুপ্রবেশকেই তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম সরকার গঠনকারী কংগ্রেস তাদের ভোটব্যাংককে শক্ত করতে মুসলমান তুষ্টীকরণের যে খেলা শুরু করেছিল, তা আজ শুধু কংগ্রেস নয় বরং মমতা ব্যানার্জি, লালু যাদব, তেজস্বী যাদব, হেমন্ত সোরেন, অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ বহু রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের দল সেই পথেই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার কাজ করে চলেছে। অবৈধ উপায়ে ভোটার আইডি, আধার কার্ড বানিয়ে এই অনুপ্রবেশকারীরা সমস্ত বিজেপি বিরোধী দলের জন্য ভোট জোটানো এবং জয়লাভের মাধ্যম হয়ে গেছে। বিপক্ষের ভয় আছে, যদি কমিশন তালিকা সংশোধন করতে নথিপত্র ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবে ভোটার তালিকা থেকে এদের নাম কাটা যাবে। আর যদি এদের নাম কাটা পড়লে তাদের ভোটে যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়বে, কেননা তুষ্টীকরণের আগুনে ক্ষমতার রুটি সেঁকা লোকেরা জানে যে, দেশে প্রবহমান রাষ্ট্রীয় ভাবনার প্রবাহে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করা তাদের পক্ষে খুব একটা সহজতর হবে না। তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়বে।

কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের যথাসাধ্য স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা নিশ্চিত করে যে, এই সংশোধনের জন্য কশিনের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি তিন বার যাবেন। তিন বারেও না পেলে তবেই তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। অনলাইনেও নাম যুক্ত করার বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কমিশন ঘোষণা করেছে, যে নাম কাটা হয়েছে এবং নতুন তালিকা তৈরি করা হয়েছে তার প্রতিলিপি শুধুমাত্র সব রাজনৈতিক দলকেই দেওয়া হবে তা নয়, বরং তা নিয়ে ওঠা আপত্তি বিষয়েও বিস্তৃত চর্চা আলোচনা করার পর চূড়ান্ত সূচি করা হবে। এসবের পরেও কমিশনের এই সিদ্ধান্তে বহু নাগরিকের নাম বাদ যাবে বলে বিপক্ষের আশঙ্কা হয়ে থাকে তবে অধ্যাপক তিওয়ারীর যুক্তিই সঠিক বলে মনে হয় যে, বিপক্ষের ছটফটানির আসল কারণ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বের করার ভয়। কারণ, দেশের প্রকৃত নাগরিকের ক্ষেত্রে অসম্ভব যে কারও বাবার নাম ২০০৩ বা তার আগে তালিকাভুক্ত ছিল না। শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব যারা ২০০৩ সালের পর অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতে এসেছে। এমতাবস্থায় বিগত কয়েক বছরের নির্বাচনী ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে বিজেপির জয় রোধ করতে মুসলমান অধ্যুষিত আসন থেকে অনবরত জয়লাভ করা অমুসলিম জনপ্রতিনিধির বিপুল পরিমাণ ভোট পাওয়ার অজস্র উদাহরণ, তবে কমিশনের সিদ্ধান্তে বিপক্ষ দলগুলি গরিব বা বঞ্চিতদের জন্য চিন্তিত নয়, বরং দেশের পরিবেশ পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অনুপ্রবেশ দমনকারী আইনের প্রয়োগে অনুপ্রবেশকারীদের ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তিত।

(লেখক একজন প্রবীণ সাংবাদিক)

বিশেষ ঘোষণা

স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত ৭৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তিকা পাঠে আগ্রহী বহু মানুষের কাছে ভাষাগত কারণে এটা সহজপাঠ্য হচ্ছিল না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু স্বস্তিকাপ্রেমী স্বস্তিকাপাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেইসব হিন্দিভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউণ্ডেসন-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা-র হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথির প্রাক্-লগ্নে আগামী ১৫ আগস্ট হিন্দি স্বস্তিকা (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করবে। আপাতত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মূল্য ধার্য হয়েছে ৩০্ টাকা।

আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পরামর্শ এই নতুন সংস্করণটির চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে— এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রকাশক,
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্টেসন

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রী রাজপথে

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

দিদিমণি পথে নেমেছেন। ভিন রাজ্যের বাঙ্গালি বসতিগুলিতে কে বা কারা নাকি অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা ধরার নামে আসল বাঙ্গালিদের হেনস্থা করছে। তাই বাঙ্গালির জন্য নিবেদিত-প্রাণ দিদিমণি বাঙ্গালির দুঃখে শোকাতুরা হয়ে রাজপথে হাঁটাহাঁটি করছেন। হাঁটুন, ভালো কথা। হাঁটলে শরীর, মন দুই ভালো থাকে। কিন্তু সবাই বলছে কথাটা নাকি সর্বৈব মিথ্যা, এ নাকি তাঁর কুমিরের কান্না। কারণ প্রথমত, এখনো পর্যন্ত রাজ্যে রাজ্যে যে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা ধরপাকড় চলছে তার মধ্যে তামিলনাড়ু, পঞ্জাব ও কেরালার শাসক আবার সম্পর্কে দিদিমণির তুতো ভাই, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, পঞ্জাবে আপ, আর কেরালায় সিপিএম— মানে সবগুলিই ইন্ডি-জোটের সদস্য।

তাই এক্ষেত্রে শুধু বিজেপিকে গালাগাল দিয়ে পার পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত, দিদি এ রাজ্যের ছানাপোনারা গত ১০-১৫ বছরে যেখানে সেখানে আধার কার্ড তৈরির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গাদের জনে জনে যেভাবে জাল পরিচয়পত্র হাতে ধরে দিয়ে মার্কেটে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে বোঝা গিয়েছিল ওই অরিজিনাল বিদেশিগুলিকে আজ হোক বা কাল হোক কোনো সরকার গলায় গামছা জড়িয়ে হিড় হিড় করে টেনে রাজ্যের বাইরে বের করে দেবে। ওই দাঙ্গাবাজ জেহাদি অপরাধীগুলিকে পুষে তারা আর যাইহোক দিদির মতো নিজ রাজ্যের সর্বনাশ হতে দেবে না। তাই এই 'বিদেশি খেদাও অভিযান' পক্ষান্তরে দিদির কারণেই ঘটছে। দিদি যদি তাদের হাতে ভুয়া আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ধরিয়ে না দিতেন তবে তারা আজ না খেত ঘাড় ধাক্কা, আর না পুড়তো দিদির মুখ। সবই দিদির অনুরাগের ছোঁয়া।

তবে দিদির বাঙ্গালি প্রীতি নিয়ে নানা মহলে সংশয় রয়েছে। 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' এই স্লোগান দিয়ে ২০২১-এ ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে বাঙ্গালি কম নির্যাতনের শিকার হয়নি। তথাপি তিনি আজ পর্যন্ত বাঙ্গালির জন্য একটি বারও পথে নামেননি। তার রাজত্বকালে কত বাঙ্গালি নির্যাতনের শিকার হলো, প্রাণ হারাল, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ল, তার সংখ্যা গণনা করা দুরূহ। ২০২১-এর নির্বাচনী ফল গণনার পর পর এই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০-৭৫ জন বাঙ্গালি প্রাণ হারিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে বাঁচাতে হাজার হাজার বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ভিন রাজ্য অসম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তখন তিনি পথে নামেননি। দাড়িভিটে উর্দুর পরিবর্তে বাঙ্গালি শিক্ষক চেয়ে স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতরে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্র রাজেশ ও তাপস মরেছে, তখন তিনি পথে নামেননি। জেহাদিদের লালসায় প্রাণ ত্যাগ করা কামদুনির নির্যাতিতা কন্যাটি থেকে শুরু করে আরজি করে ধর্ষণের শিকার হয়ে যাওয়া বোনটি অথবা কসবা ল'কলেজের নির্যাতিতা মেয়েটি— যারা শাসক দলের চ্যালা চামুণ্ডাদের হাতে কলেজের ভিতরে প্রতিনিয়তই লাঞ্ছনার শিকার হন, তারা কি বাঙ্গালি নয়? কই তখন তো তিনি পথে নামেননি?

> **মুখ্যমন্ত্রী আসলে 'বাঙ্গালি'র নাম করে এ রাজ্যের হিন্দু বাঙ্গালিকে ভুল বুঝিয়ে, খেপিয়ে সেই মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষা করার প্রয়াস করছেন যারা বছরের পর বছর দুর্নীতি, ধর্ষণ, হত্যা, দেশ বৈরিতা, হিন্দু বিরোধিতার পরেও তৃণমূলি শাসককে গদিতে বসিয়ে রাখছে।**

ক'মাস আগে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, ২৪ পরগনার মহেশতলায় বাঙ্গালিদের উপর যে জেহাদি সন্ত্রাস হয়ে গেল, বেছে বেছে বাঙ্গালি পরিবারগুলির উপর আক্রমণ শানানো হলো, সম্মান বাঁচাতে মা-বোনেরা ভিটামাটি ছেড়ে মালদায় আশ্রয় নিতে গেল, হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস— দুই বাঙ্গালি বাপ-ছেলে জেহাদিদের হাতে প্রাণ দিল, কই তখনতো দিদি পথে নামেননি? আবার এই পশ্চিমবঙ্গের ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা, যারা এই রাজ্যেরই ছেলে-মেয়ে, তারা চাকরি চোর শিক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত অসহযোগিতায় দশ বছর চাকরি করার পর বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলো, তারপর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশের লাথি খেল, নেতাদের ধমক খেল, আজও অসহায় বিভ্রান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কি বাঙ্গালি নয়? তাদের জন্য দিদি কি একবারের জন্যও পথে নেমেছেন?

ফঃ ২

না, নামেননি। দুর্জনেরা বলছেন তার এই বাঙ্গালি-প্রীতি প্রদর্শন দু'টি কারণে। এক, আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের কাছে খবর আছে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা দেশে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছে। আর তাই বিহার নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা অবৈধ ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করছে। তাতেই সমূহ বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন দিদিমণি। বিহারের ঘরে ঘরে আজ সার্ভে চলছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫২ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা-সহ অসংখ্য মৃত ব্যক্তি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

আসল থেকে যেমন সুদ বেশি মিষ্টি হয়, তেমনি আসল বাঙ্গালি ভোটারের থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গারা শাসকদলের বড়ো প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সাহায্যে সেই বিদেশিরা আধার, ভোটার, প্যান-কার্ড এমনকী জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহ করে তারা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ছে। এটি আজ জনগণের কাছ থেকে আর কোনো মতেই লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

তার উপর ২০২৫-এর রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট। এখানেও যদি নির্বাচন কমিশন বিহারের মতো দৌরাত্ম্য শুরু করে তবে তো দিদির ভোটব্যাংকের দফা রফা! এই রাজ্যে দেড়-দু'কোটি অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গা যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে যায় তবে দল ক্ষমতায় ফিরে আসবে কী করে? সকলেই জানেন, শাসকদলের ভোটব্যাংকের মূল অংশটাই এরাজ্যের তেত্রিশ শতাংশ দুধেল গাই। তার মধ্যে যদি নির্বাচন কমিশন এক কোটি নামও কেটে বাদ দেয় তবে তো ক্ষমতায় ফেরা দুরূহ। কারণ ২০২১-এর নির্বাচনে শাসক দল ও বিজেপির ভোটের পার্থক্য ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ।

বহুবিধ কারণে বাঙ্গালি হিন্দু আজ দিদির উপর খাপ্পা। বাঙ্গালির পূজা-পার্বণ, উৎসবে দুধেলরা বারে বারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। হাওড়া, হুগলি, চন্দননগর, দুই দিনাজপুর, বীরভূম— সর্বত্র রামনবমী উৎসবে পাথর, বোমা ছোঁড়া হচ্ছে। ফালাকাটা, শ্যামপুর, গার্ডেনরিচের দুর্গাপূজায় আক্রমণ চলছে, সিএএ এবং ওয়াকফ বোর্ডের বিরোধিতায় সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, মালদা— বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালির ঘরে ঘরে জেহাদি সন্ত্রাস চলছে। তার উপর আছে শাসক নেতাদের চোখাচোখা হিন্দুবিরোধী বাক্যবাণ। কেউ বলছেন— মুর্শিদাবাদে ৩০ শতাংশ হিন্দুকে ভাগীরথীর জলে কেটে ভাসিয়ে দেবেন, কেউ বলছেন— মনে করলেই তিনি কলকাতাকে লক্ষ মানুষ দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারেন, তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিকেও টাইট দিয়ে ছাড়বেন, আবার কেউ বলছেন— বাঙ্গালিরা দুর্ভাগা, কারণ তারা ইসলামের ঘরে জন্ম নেননি, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানাতে হবে। আগে বাঙ্গালি হিন্দু বেশ সুখে ঘুমিয়েছিল, এসব নিয়ে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। কিন্তু আজকাল এসবের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি হিন্দু রুখে দাঁড়ানো শুরু করেছে। এসব শাসকদলের ভালো ঠেকছে না।

তাই ২০২৬-এর পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। ১৫ বছরের 'দুধেলগাই-নির্ভর' শাসন পশ্চিমবঙ্গকে যেন ধীরে ধীরে বাংলাদেশ পার্ট-টু-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হেথায় ঘরের বউদির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার, দেড় হাজার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো ট্রান্সফার হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মীরা আজ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান আর রোহিঙ্গাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। ভোট হারাবার ভয়ে শাসকদল নিশ্চুপ। শাসকদলের এই চাতুরি বাঙ্গালি ধীরে ধীরে অনুভব করছে। তাই বিবিধ প্রকার শ্রী, সাথী, আর ভাতা-র মুখে ছাই দিয়ে তারা আজ পরিবর্তনের প্রহর গুণছে। সম্প্রতি মুসলমান অধ্যুষিত কালীগঞ্জ বিধানসভা তার হাতে গরম প্রমাণ। সেখানে প্রায় ৭৫ শতাংশ হিন্দু ভোট একত্রিত হয়ে বিজেপির ঝুলিতে পড়ছে। তার অর্থ প্রকৃত বাঙ্গালিরা আজ শাসকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এমনি কঠিন সময়ে নির্বাচন কমিশন যা শুরু করেছে তা যদি সফল হয় তবে 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' দেড় দু' কোটি বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গা ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে। তবে তো আগামী ২৬-এ শাসকের জেতার কোনো সুযোগই থাকবে না। তাই এখন ঝুলি থেকে বাঙ্গালি নির্যাতনের নতুন গল্প ফাঁদা, আর বাঙ্গালি হিন্দু ভোটকে ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা। নিজেকে বাঙ্গালির একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী প্রমাণের প্রচেষ্টা। তাই দিদিমণির শুধু পথে নামাই নয় তার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে নিরস্ত করতে 'ভ্যানিটি ব্যাগ নেত্রী'কে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি কেসও ঠুকে দিয়েছিলেন, যাতে নির্বাচন কমিশনের এই অবৈধ ভোটার খোঁজার অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পত্রপাঠ তা খারিজ করে দেওয়ায় দিদির কপালে আরও বড়ো চিন্তার ভাঁজ।

সিআর পার্ক হলো বাঙ্গালি অধুষিত, দিল্লির মিনি কলকাতা। ১৯৪৭ সালে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের সময় যেসব হিন্দু বাঙ্গালি বাংলাদেশ থেকে চলে আসছিল তারা থাকেন এখানে। সংখ্যা কয়েক হাজার। এখানে ইলিশ মাছ, কচুর লতি, ডাটা চচ্চড়ি, সুক্তো সব পাওয়া যায়। দিল্লিতে এইরূপ বাঙ্গালি মহল্লা আরও বহু আছে। কিন্তু কখনো শোনা যায়নি এই বাঙ্গালিদের উপর কখনো কেউ অত্যাচার করেছে। শুনবার কথাও নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালিরা দিল্লিতে সুখে শান্তিতেই বসবাস করছে। তবে আজ যেগুলি দিদির কাছ থেকে শুনেছেন দেখছেন তা কি সব মিথ্যা? না, সেগুলি মোটেই মিথ্যা নয়। দিল্লির বস্তি থেকে বাঙ্গালি বিতাড়নের যেসব ছবি দেখছেন সেগুলি সবই অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গা তাড়াবার ছবি। গত ২৫ বছরে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি এই বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের দিল্লির বিভিন্ন বস্তিতে শুধু থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের ফ্রি ইলেকট্রিক, ফ্রি জল, ফ্রি গ্যাস প্রভৃতি দিয়ে তাদের ভোটার বানিয়ে ফেলেছিল। আজ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দিল্লিতে এই অবৈধ ভোটার চিহ্নিতকরণ

এবং তাদের তাড়াবার ব্যবস্থা চলছে। তাকেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালি নির্যাতন আখ্যা দিচ্ছেন। তবে এই অবৈধ ভোটার তাড়ানো কেবলমাত্র দিল্লিতেই চলছে এমন নয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাব, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালার মতো অবিজেপি রাজ্যগুলিও এই বিদেশি বিতাড়নের কাজ করছে। অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গারা পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের পার্টি অফিস, পঞ্চায়েত দপ্তর, পৌরসভা থেকে জাল বার্থসার্টিফিকেট বানিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, জব কার্ড— সবই তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে তারা ভারতের নাগরিক হয়ে ওঠেনি।

তাই পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালার মতো বিজেপি বিরোধী সরকারও পশ্চিমবঙ্গের আধার কার্ডধারী বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের সঠিক পরিচয় খোঁজা করা শুরু করেছে। উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়ায় পত্রপাঠ পশ্চিমবঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যের অধিকার আছে তার রাজ্যের প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থা ঠিকমতো রক্ষা করার। এই রোহিঙ্গা ও অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমানরা প্রতিটি রাজ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। তাদের রাজ্যের কাছে এ এক থ্রেট। তাদের রাজ্য কোনো ধর্মশালা নয়। এই অপরাধীদের জন্য তাদের রাজ্যের দরজা খোলা রাখবার কোনো অভিপ্রায় না থাকারই কথা। তাই বিদেশিদের তারা যথার্থ ভাবেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। তাকে বাঙ্গালি নির্যাতন আখ্যা দেওয়া এক চক্রান্ত। ভারতবর্ষের মোট বাংলা ভাষায় কথা বলা বাঙ্গালির প্রায় ২৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসবাস করেন। তারা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি-সহ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই সংখ্যাটা আজ কমপক্ষে ২ কোটি। সেখানে প্রতি বছর বাঙ্গালির দুর্গাপূজা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তারা আমোদ করে তাদের প্রিয় আহার মাছ-মাংস-ডিম খান, তাদের যদি বাংলাভাষী বলে কেউ তাড়িয়ে দিত তবে তো সে রাজ্যগুলি আজ বাঙ্গালি শূন্য হয়ে যেত। তা তো হয়নি। এই দু' কোটি মানুষকে কেউ বাংলাদেশি রোহিঙ্গা অপবাদ দিয়ে কেবল তাড়াচ্ছে না। তাড়াচ্ছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের। বিগত ১৪ বছরে বহু রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। এই ক'বছরে একজনও বাঙ্গালি অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেনি তো? বরং এই ১৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গের যুবক এই রাজ্যের কাজ নেই বলে গুজরাট ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে ভালো চাকরি করছে। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে সেখানেই স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। যদি বাঙ্গালির উপর অত্যাচার হতো তবে চার বছর আগে কোভিড কালে যারা ঘরে ফিরে এসেছিল তবে কি তারা কোভিড শেষে আবার সেখানে ফেরত যেত?

যেমনভাবে হাজার বছর ধরে মুসলমানদের আড়াল করা হয়েছিল পাঠান, মুঘল নামে। ১৯০ বছর ধরে খ্রিস্টানদের আড়াল করা হয়েছিল ব্রিটিশ নামে, ঠিক সেভাবেই এখন অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালি বলে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। ক্ষমতা লোভী নেতারা হিন্দু বাঙ্গালির আবেগ নিয়ে খেলা করছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে বাঙ্গালির সঙ্গে প্রতারণা করছে। বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নিজের ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখতে বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য তৈরি একমাত্র বাঙ্গালি হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে উদ্যত। আমাদের বুঝতে হবে, ইংরেজিতে কথা বললেই যেমন যে কেউ 'ইংরেজ সাহেব' হয়ে যায় না, সেরূপ বাংলা ভাষায় কথা বললেও যে কেউ 'বাঙ্গালি' হয়ে যায় না, অনেকে বাংলাদেশিও হয়, রোহিঙ্গাও হতে পারে। এরকম অসংখ্য অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ঢুকে আছে এই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এমনই বাঙ্গালি প্রীতি যেদিন ভারতের পার্লামেন্টে উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালিকে নাগরিকত্ব দেবার জন্য নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার 'সিএএ' বিল পাশ করল সেইদিন সেই বিলের বিরুদ্ধে এরা চিল-চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন। বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা যাতে কোনোমতেই এদেশের চিরস্থায়ী নাগরিকত্ব না পান তার জন্য 'ক্যা-ক্যা ছিঃ-ছিঃ' স্লোগান তুলেছিলেন। অথচ আজ এরাই অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান- রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে পথে নামছেন। মুখ্যমন্ত্রী আসলে 'বাঙ্গালি'র নাম করে এ রাজ্যের হিন্দু বাঙ্গালিকে ভুল বুঝিয়ে, খেপিয়ে সেই মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষা করার প্রয়াস করছেন যারা বছরের পর বছর দুর্নীতি, ধর্ষণ, হত্যা, দেশ বৈরিতা, হিন্দু বিরোধিতার পরেও তৃণমূলি শাসককে গদিতে বসিয়ে রাখছে। বাঙ্গালি তুমি অনেক ঘুমিয়েছো। এবার চোখ খুলতে হবে। এখন শত্রু ও বন্ধু চেনার সময়। আজ 'পক্ষ' বাছতেই হবে। নাহলে মৃত্যু অবধারিত। শত্রুর কথায় অযথা বিভ্রান্ত হলে চলবে না। জানতে হবে বাঙ্গালি নয়, দেশজুড়ে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গা তাড়াবার কাজ চলছে। করছে ভারতের নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারগুলি। ভারতের কোনো রাজ্যেই প্রকৃত বাঙ্গালিকে হেনস্থা করা হচ্ছে না। অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান আর রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া করা হচ্ছে। এতে প্রকৃত বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত হবে। যারা এই মহান কাজ করছে তাদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ভোটার তালিকা সংশোধনে তৃণমূলের ভয় কেন!

সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অবৈধ ভোটারদের কোনোরকম ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়

আনন্দ মোহন দাস

বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংবাদে প্রকাশ, ৭.৯ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ ভোটারের কাছে নির্বাচন কমিশন এখনো পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

ইতিমধ্যে কমিশন সূত্রে যা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তা বেশ চাঞ্চল্যকর। মোট ভোটারের ৫.৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪১.৬ লক্ষ ভোটারের ঠিকানায় বুথ লেভেল অফিসাররা তিনবার যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিহারে এখনো পর্যন্ত এই সংশোধনীর কাজ প্রায় ৯৬ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। সেখানে ১১ হাজার ভোটারের কোনোরকম অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। নির্বাচন কমিশনের আশঙ্কা, তাঁরা সম্ভবত বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। তারা বিহারের বাইরে লুকিয়ে রয়েছেন এবং তাঁদের নাম সম্ভবত জাল ভোট দেওয়ার কাজে বিহারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে, ১৪.৩ লক্ষ (১.৮ শতাংশ) ভোটার সম্ভবত মারা গিয়েছেন, যাঁদের নাম এখনো তালিকায় রয়েছে। ১৯.৭ লক্ষ (২.৫ শতাংশ) ভোটার স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, ৭.৫ লক্ষ (০.৯ শতাংশ) ভোটারের নাম একের অধিক স্থানে ভোটার তালিকায় রয়েছে। জাল ভোট দেওয়ার জন্য এ ধরনের মৃত ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কখনো বাদ দেওয়া হয়নি। দেখা যাচ্ছে, ৪১ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পৃথক ভাবে বাদ গেলে জয়ের মার্জিনের থেকেও সংখ্যা বেশি হবে। সুতরাং স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো এসমস্ত নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। এটা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু সংশোধনীর কাজে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও এনডিএ বিরোধী দলগুলির এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর

তীব্র বিরোধিতা সন্দেহের উদ্রেক করে। তাহলে এসমস্ত অবৈধ ভোটারই কি এদের ভোটব্যাংক? সেজন্য বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিরোধীদের শত আবেদন সত্ত্বেও আদালত নির্বাচন কমিশনের এ কাজে কোনোরকম স্থগিতাদেশ দেয়নি। এছাড়াও পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশন দেশের সব রাজ্যেই একই ধরনের সংশোধনীর কাজ সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করেছে।

খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজ শুরু হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরনের বিশেষ সংশোধনীর কাজ আসন্ন। তারা হয়তো আশঙ্কা করছে, এ ধরনের সংশোধনীর মাধ্যমে তাদের অবৈধ ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখা খুব মুশকিল হবে। সেজন্য বিষয়টিকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনের বুথ লেভেল অফিসার ছাড়াও প্রত্যেক স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও প্রত্যেকটি বুথে থাকবেন। সুতরাং তালিকা থেকে বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া কোনোভাবেই বুথ লেভেল অফিসারদের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। সেজন্য এ ধরনের সংশোধনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। শাসকদলের বিরোধিতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীর কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করা নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। যদিও বুথ লেভেল অফিসারদের এ কাজে কোনোরকম বাধা দিলে নির্বাচন কমিশন এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩২৬ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো, কেবল বৈধ ভারতীয় নাগরিকরাই যাতে দেশের সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা। সুতরাং স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে সময়ে সময়ে এ ধরনের ভোটার তালিকা সংশোধনী একান্তভাবে প্রয়োজন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি অবৈধ ভোটার রয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছেন। মূলত এরা বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা, যারা কোনো ভাবেই এদেশের নাগরিক নয়। দেশের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধ ভোটারদের কোনোরকম ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়েও বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এরাজ্যে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের আধিক্যের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজ্যের জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে।

এরাজ্যে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের আধিক্যের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাজ্যের জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। প্রচারের ঢক্কানিনাদের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের গোলাপি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা হলেও অন্ধকার দিকগুলি জনগণের সামনে ভেসে উঠছে।

সূত্রের খবর, কয়েক কোটি বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। শাসকের বদান্যতায় এরা রেশন কার্ড, আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে জনবিন্যাস ভারসাম্যহীন হয়েছে, যা আগামী দিনে বিপদের সূচনা করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও ভোটার বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ বেশি। এর মূল কারণ হলো অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের ভোটার বানানো, যারা এদেশের নাগরিক নয়। কোনো দেশই বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার দেয় না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বৈধ নাগরিক ছাড়া ভোটার তালিকায় কোনোরকম বিদেশি ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম থাকা দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটির বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা বাস করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত এক দশকে রাজ্যে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩.৯৩ শতাংশ। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সীমান্তবর্তী জেলায় অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলেই এ ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। সেজন্য দেশের ও রাজ্যের স্বার্থে ভোটার তালিকা থেকে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া একান্ত জরুরি, যা বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশন দৃঢ়ভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে গণতন্ত্র মজবুত হবে এবং দেশ সুরক্ষিত থাকবে। □

বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট গেয়ে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান রক্ষার কৌশল মমতা ব্যানার্জির

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

নৈতিকতা রক্ষা এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বড়োই বেকায়দায় ফেলে প্রতিবারের নির্বাচন। এখন আবার শুরু হয়েছে নতুন এক প্রিপোল ড্রামা--- কিছুতেই 'বাংলা-বাঙ্গালি-বাঙ্গালিয়ানা' আক্রান্ত হতে দেবো না। যে মুহূর্তে এই নিবন্ধের অবতারণা, তার ঠিক কিছু সময় আগেই হরিয়ানার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন মমতা ব্যানার্জি। হরিয়ানা সরকার ৫২ জন বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে তাদের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে চিহ্নিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সব জেলা থেকে তারা এসেছে বলে দাবি করেছে, তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই সকল জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়েছে হরিয়ানা সরকার। ব্যাস্! এহেন ঘটনা ঘটলেই তাতে প্রবল বাঙ্গালি বিদ্বেষী মনোভাব দেখতে পান মমতা ব্যানার্জি। চোখে ভোটস্বপ্ন নিয়ে এক বিভ্রান্তিকর ন্যারেটিভ তৈরি করছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ভারতের যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি পরিচালিত সরকার রয়েছে, সেখানেই নাকি বাঙ্গালি-বিদ্বেষী আচরণ চলছে। প্রশ্ন হলো— সত্যিই কি তাই?

এটা তার একটি ডাহা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। কারণ সত্যিটা হলো ভারত জুড়েই বাংলাভাষী ধরা পড়ছে, যারা বাংলাভাষী হলেও 'বাঙ্গালি' নয়। সেই সব অসংখ্য বাংলাভাষী হলো অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। দুর্নীতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের শাসক দলের মদতে এই অনুপ্রবেশকারীরা যাবতীয় নথি ও পরিচয়পত্র তৈরি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে। তারা বাংলাদেশ বা মায়ানমারের বাসিন্দা, অর্থাৎ বিদেশি নাগরিক হলেও ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে নিয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা ঘাপটি মেরে থাকে ভারতের বিভিন্ন দিকে। কোথাও তারা জেহাদি, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত, কোথাও তারা নানারকম জাল, অবৈধ লেন-দেন, মানুষ পাচার চক্র চালায়, কোথাও বা অঙ্গ পাচার, মাদক পাচার চক্রের তারা মাথা। তাদের অনেকেই আবার বিভিন্ন লোকের ঘর-গৃহস্থালিতে, দেশের নানা সংগঠিত-অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ তাদের 'মুক্তাঞ্চল'। মায়ানমার, বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে ঢুকে এই অনুপ্রবেশকারী জেহাদিরা ছড়িয়ে যায় ভারতের নানা প্রান্তে। তাদের চিহ্নিতকরণ ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া যদি চলে তবে তা হলো অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন। বাঙ্গালি নির্যাতন নয়। মমতা ব্যানার্জির চিলচিৎকার জুড়ে অভিযোগ করছেন যে, পরিযায়ী, বাংলাভাষী, বাঙ্গালি শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে, তাদের রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তাহলে তামিলনাড়ুর ঘটনাকে কী বলবেন মুখ্যমন্ত্রী? আপনার ইন্ডিজোট-সঙ্গী স্তালিনের রাজ্যেই গত ১৬ জুন তামিলনাড়ু সরকারের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এক ঝটকায় ২৫ জনের উপর বাংলাভাষী অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করল। হতে পারে তারা বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা মুসলমান। জঙ্গিদের দ্বারা পহেলগাঁওয়ের নৃশংস ঘটনার পর প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারকেই অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে সচেতন হতে নির্দেশ পাঠায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতেই ২০২২ থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ২০২ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছে এবং তারা সবাই বাংলাভাষী। বাংলাভাষায় তারা কথাবার্তা বললেও তারা কিন্তু কেউই 'বাঙ্গালি' নয়, কেউ বাংলাদেশি মুসলমান, কেউ রোহিঙ্গা মুসলমান। রাজনৈতিক স্বার্থে মমতা ব্যানার্জি বিজেপি শাসিত হরিয়ানার উদ্দেশ্যে অতি প্রতিক্রিয়াশীল হলেন এবং জোটসঙ্গী স্তালিন-শাসিত তামিলনাড়ুর বেলায় চুপ থাকলেন। এই ঘটনাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এটা তার কোনো প্রতিবাদ বা বাঙ্গালি-দরদ নয়। কেবলমাত্র ভোট সংক্রান্ত অঙ্ক কষে পশ্চিমবঙ্গের ভাতাপ্রিয় বাঙ্গালিকে স্নায়বিক স্তরে বিচলিত করার লক্ষ্যে এই নকল প্রতিবাদের নাটক করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যে, আমি আছি তাই বাঙ্গালিয়ানা জিইয়ে রেখেছি। বাস্তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মেলা-খেলা, কাটমানি-কারচুপি করে চলছে তাঁর দল ও সরকার। মাছ-ভাত প্রিয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গাঁ-গঞ্জ, ব্লক ও

> **অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার সময়ে ভাষা-উচ্চারণ-শব্দ নয়, নাগরিকত্বের অনুসন্ধানটাই হওয়া উচিত প্রথম ও প্রধান উপকরণ। মমতা ব্যানার্জি জানেন সেটাই হতে চলেছে। আর জানেন বলেই ভোটব্যাংক এবং নিজের গদি বাঁচাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নেমে পড়েছেন।**

জেলার মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করছেন— কিছু মনগড়া উদাহরণ টেনে, তার আবার বিকৃত ব্যাখ্যা ইত্যাদি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, ভিন রাজ্যে বাঙ্গালি আক্রান্ত। অর্থাৎ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসা মানেই বাঙ্গালির সর্বনাশ! রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এই ফ্যালাসি প্রমাণের দারুণ ফন্দি বের করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ আরও তুঙ্গে উঠল যখন বিহারের ভোটার তালিকা থেকে ৫২ লক্ষ নাম বাদ গেল। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার পর তালিকায় থাকা মৃত ও স্থানান্তরিতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় এহেন সংশোধনীর ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধী দলগুলি নানা সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে তরজা শুরু করলেও তা একান্তই নির্বাচন কমিশনের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বলে জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এই সংশোধনীর কাজ শুরু হলে, এই প্রক্রিয়ার ফলে মমতা ব্যানার্জির ভোট অন্তঃপুরে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোনোর সম্ভাবনা প্রবল। তাই বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট খেলিয়ে ভোটারের স্নায়ুতে সিমপ্যাথির ভিত শক্ত করছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এবং অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানের বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ গুলিয়ে দিয়ে 'বাংলাভাষী' মানেই ভারতীয় বাঙ্গালি এমন একটি ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বাংলা পক্ষ। কিন্তু এই ভুল ধারণা এবং মিথ্যে প্রচার থেকে বাঙ্গালিকে মুক্ত হতেই হবে। কারণ সারা বিশ্ব আজ সন্ত্রাসবাদের নিকেশ চায়। এই ক্ষেত্রে তিনটি শব্দ যথা 'এথনিসিটি, রেস ও ন্যাশনালিটি'-র উপর চুলচেরা বিশ্লেষণ জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এই তিনটি বিষয়কে গুলিয়ে দিয়ে এক প্রবল ঝঞ্ঝাট তৈরি করেছে। 'ন্যাশনালিটি' বা 'সিটিজেনশিপ' হলো কোনো দেশের বৈধ নাগরিকত্ব। ধর্ম ও ভাষা কিন্তু সেখানে বিষয় নয়। নাগরিকত্বের বৈধতাই প্রমাণ করে একজন ব্যক্তি সেই দেশের নাগরিক কি না। 'রেস' হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষের শরীরের গঠন, চেহারার বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, গাত্রবর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে একটি সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট। 'এথনিসিটি' হলো ভাষা, জীবন অভ্যাস (লাইফ স্টাইল), উত্তরাধিকার, বংশ-পরম্পরা, ঐতিহ্য এবং কালচারাল সেন্স বা সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত বিভিন্ন মানব সমাজ। এবার প্রশ্ন হলো একই ভাষায় কথা বললেই কি তারা এক রেস? ভূ-রাজনৈতিকভাবে যুক্তির খাতিরে তারা যদি এক রেস হয়ও, তবে তারা সাংস্কৃতিকভাবে এক রেস নাও হতে পারে। মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক ভাষণ ও মিথ্যাচারে মনে হবে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যেই বাংলায় কথা বলছে সেই যেন পশ্চিমবঙ্গের বা বৃহত্তর আঙ্গিকে ভারতীয় বা প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালির মতো এক সাংস্কৃতিক স্তরের। ভুলটা সৃষ্টি হচ্ছে এখানেই। রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাংলা খানিকটা চাটগেঁয়ে (চট্টগ্রামের) বাংলার মতো। চাটগেঁয়ে বাংলা আর নোয়াখালির বাংলার উচ্চারণ কিছুটা পৃথক। এখন যদি রোহিঙ্গা মুসলমান এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালিকে একযোগে 'বাঙ্গালি' বলে একসারিতে রাখা হয় তবে তা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যেই যে এই কাজ করা হচ্ছে তা পরিষ্কার। এই ধরনের বিভিন্ন উচ্চারণে বলা বাংলাভাষা কিছুটা কাছাকাছি হলেও এই ভিন্ন ধরনের বাংলাভাষীদের ন্যাশনালিটি তো আলাদা। রেসটাও অবশ্যই ভিন্ন।

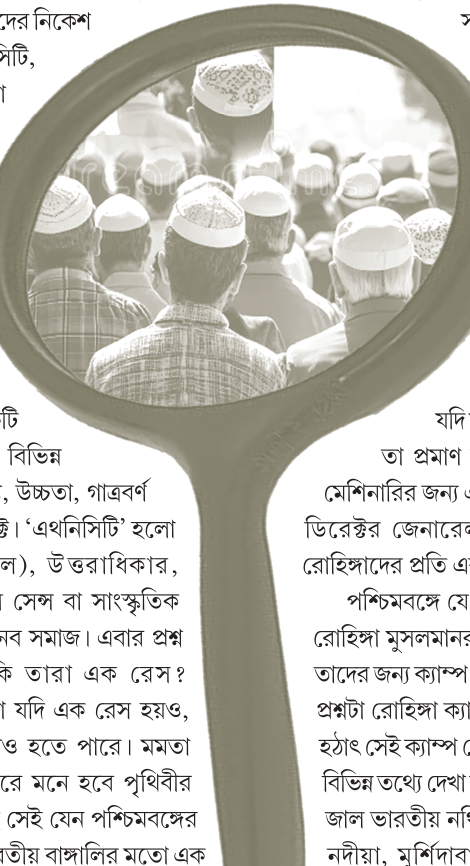

বাংলাভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যান না। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, যথা— আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টা রিকা, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সালভাডোর, মেক্সিকো, পানামা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, পেরু, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া এবং ইওরোপের দেশ স্পেনের অধিকাংশ মানুষ 'স্প্যানিশ' ভাষায় কথা বলেন, এমনকী দেশগুলির সরকারি ভাষাও স্প্যানিশ। তাই বলে কি একজন মেক্সিকান স্প্যানিশ হয়ে যাবেন? বা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে বলতে একজন মেক্সিকান কিউবা গিয়ে হয়ে যাবেন কিউবান? বা একদল আর্জেন্টিনার মানুষ চুপিচুপি পানামা আসবে আর হয়ে যাবে সেই দেশের নাগরিক? অর্থাৎ শুধুমাত্র ভাষা এক মানেই রেস বা জাতিসত্তা এবং অতি অবশ্যই ন্যাশনালিটি (নাগরিকত্ব বা দেশীয় পরিচয়) এক নাও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের এখন সেই সংকট! একজন রবীন্দ্রপ্রিয় বাঙ্গালি, ওপার বঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশের একজন মুজাহিদিন জঙ্গি এবং একজন রোহিঙ্গা মুসলমান— এরা সকলেই বাংলায় কথা বলে থাকে। পার্থক্য শুধু অ্যাক্সেন্টের। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া বা দিনাজপুরের বাংলাভাষার উচ্চারণ ভিন্ন হলেও মনে রাখতে হবে বাঁকুড়া বা দিনাজপুর এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ। যেহেতু 'অনুপ্রবেশ' হলো দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে একটি জ্বলন্ত সমস্যা, তাই আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো, বাংলা বলা অজানা-অচেনা লোকগুলির পরিচয় খোঁজ করার মাহেন্দ্রক্ষণ এই মুহূর্তে উপস্থিত। তাতে যদি মমতা ব্যানার্জি এতটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন তবে তা প্রমাণ করে যে, অনুপ্রবেশকারী থাকাটা তার ভোট মেশিনারির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ২০১৮ সালে বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল কেকে শর্মা স্পষ্ট বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রোহিঙ্গাদের প্রতি একটু বেশিই দরদি।

পশ্চিমবঙ্গে যে সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমানরা বসবাস করছে, রাজ্য সরকারের তৎপরতায় তাদের জন্য ক্যাম্প পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। যদিও প্রশ্নটা রোহিঙ্গা ক্যাম্প নয়। বড়ো সমস্যাটি হলো যখন দেখা যায় হঠাৎ সেই ক্যাম্প থেকে লোকজন গায়েব। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের বুকে রমরমিয়ে চলছে জাল ভারতীয় নথি তৈরির ব্যবসা। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে টাকা দিলেই জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান

কার্ড, রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এমনকী পাসপোর্ট পর্যন্ত মেলে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলা থেকে ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, একদল মানুষের এক হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট, অন্যহাতে ভারতের ভোটার আইডি কার্ড। এইসব ভূতুড়ে ভোটার আসলে সন্ত্রাসী। তারা যে ভারতবিরোধী অপশক্তি এনিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তারা যে বাংলাভাষী তা একপ্রকার নিশ্চিত। তাদের অনেকেই ধরা পড়েছে তামিলনাড়ু বা কেরালার জঙ্গি ঘাঁটি থেকে। ২০১৮-১৯-এ বনগাঁতে জাল ভোটার কার্ড চক্র ধরা পড়ে। সীমান্তের ওপারের ভারত বিদ্বেষী, বাংলাদেশি, আরবি-জারিত বাংলায় কথা বলা জেহাদিরা ভারতে আসে ভারত বিরোধী চক্রান্ত সিদ্ধ করতে। তার প্রস্তুতির মুক্তাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ। রত্না বিশ্বাসের মতো হাবরার তৃণমূলনেত্রীরা এদের দেয় ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি বিরাট অংশ অরক্ষিত। জমি না দেওয়া-সহ রাজ্য সরকারের নানা অসহযোগিতার কারণে সেখানে কাঁটাতার দেওয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি।

২০০৫ সালে কিন্তু মমতা ব্যানার্জির চোখে বাংলাদেশি মুসলমানরা 'অনুপ্রবেশকারী'ই ছিল। সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "The infiltration in Bengal has become a disaster now. You can see the Bangladeshi and the Indian voters' list. This is a very serious matter. I would like to know when would it be discussed in the House?" তারপর ২০১৮ সালে তিনি অবতীর্ণ হলেন এক নতুন রূপে। রাজ্যজুড়ে তিনি তুমুল ঝড় তুললেন সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) নিয়ে। সরকারপক্ষ প্রস্তাবিত কোনো বিলে যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে বা তা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তবে বিতর্ক ও বিবর্তন সাপেক্ষে তা সংশোধিত ও পরিমার্জিত করার দায়িত্ব বিরোধীপক্ষের। কিন্তু তার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যদি রাজনৈতিক ভোটসর্বস্বতায় ব্যর্থ হয়, তখন ওপারের আয়েশারা এপারে এসে ভুয়ো অনামিকা হয়ে যায়। ভারতের জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে তা হয় একটি বিপদ সংকেত। ২০০৫ সালে মমতা ব্যানার্জি জানতেন যে, পশ্চিমবঙ্গ হলো অনুপ্রবেশের উর্বর জমি। ওই বছরের ৪ আগস্ট বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি লোকসভার ডেপুটি স্পিকার চিরঞ্জিত সিংহ অটওয়ালকে লক্ষ্য করে তড়িৎবেগে অনুপ্রবেশকারীদের নাম-পরিচয় সংবলিত একটি কাগজের বান্ডিল ছুঁড়ে দেন। ১৯৯৮ সালে যখন তার দল তৃণমূল কংগ্রেস সদ্য গঠিত হয়েছে, তখন তিনি অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে একটু নরম অবস্থান নিয়েছিলেন। তৎকালীন মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার বেশ কিছু মুসলমান, পরিযায়ী শ্রমিককে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক করে। সেই প্রেক্ষিতে ওই বছরের ২৭ জুলাই সংসদে দাঁড়িয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশে মমতা ব্যানার্জি বলেন— '...even if somebody is a Bangladeshi, he should not be treated like cats and dogs, as we have traditional ties, ethnic and common culture with Bangladesh...' ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যখন অনুপ্রবেশের বাড়বাড়ন্ত, তখন সেই জাতীয় সংকটকে রুখতে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকার নানা ব্যবস্থা নিলে তা অনেক সময় দেশের নিরীহ, সাধারণ নাগরিকদেরও বিরক্তির কারণ হয়। কিন্তু প্রশাসনও কখনো কখনো কর্তব্যবোধে অবিচল থাকে। সংসদে দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জির দু'টি ভাষণ পাশাপাশি দেখলে একাধারে তার অনুপ্রবেশ বিরোধ এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি তার হালকা প্রীতি কেমন যেন মিলেমিশে একাকার মনে হবে।

১৯৯৮-এর সেই অল্পসংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষবৃক্ষের চারাটি শাখা-প্রশাখা মেলে আজ রীতিমতো মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তার ডালে ডালে নৃত্য করছে জালি ভোটার, জঙ্গি, মোল্লাবাদ। পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে এরা গড়ে তুলছে অসংখ্য মিনি পাকিস্তান। পুলিশ পর্যন্ত সমঝে চলে এইসব লুঙ্গিবাহিনীদের। এরা তৃণমূলের ভোটব্যাংক ও ভোট মেশিনারি। তৃণমূলের এই সম্পদদের ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু হলেই তৃণমূলের প্রচণ্ড ক্রোধ ঝরে পড়ে, চারিদিকে তারা তোলে গেল গেল রব। দেশজুড়ে যেই ভোটার তালিকা সংশোধনের পর্ব চলছে, অনুপ্রবেশকারীদের ধরপাকড় চলছে, সেই আবহে বাঙ্গালিয়ানার তান ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ও তাঁর দল প্রচার শুরু করেছেন যে, দেখে দেখে বাঙ্গালি খেদাও, বাঙ্গালি ধরো, বাঙ্গালি হটাওয়ের প্রক্রিয়া দেশজুড়ে চলছে। এইসব রাজনৈতিক শ্লোকের মাধ্যমে মিথ্যাটা একবার সাধারণ বাঙ্গালি জনতার মগজে ঢোকাতে পারলেই তার কেল্লা ফতে! রেসের যে বিষয়টি রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রেস বা জাতিটি যে দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই দেশের প্রতি আনুগত্যও। বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে ভারতবোধ বা রাষ্ট্রচেতনা তাই সম্পৃক্ত। ভারত (পশ্চিমবঙ্গ) ও বাংলাদেশের কালচারাল ও লিঙ্গুইস্টিক ন্যাশনালিজমের মধ্যে তফাত অসংখ্য মাইলের। যদিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এখন চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে রিলিজিয়াস (ইসলামিক) ন্যাশনালিজমের। একজন বাংলাভাষী মুসলমান ভারতীয় না বাংলাদেশি সেই পার্থক্য একজন তামিলনাড়ু বা গুজরাটের আধিকারিক সহজে ধরতে পারেন না। সেই সুযোগে ভারতীয় বাঙ্গালিদের সঙ্গে আরবি-মিশ্রিত বাংলাভাষায় কথা বলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা চাটগেঁয়ে (চট্টগ্রাম ঘেঁষা) বাংলাভাষায় কথা বলা রোহিঙ্গাদের এক করে দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। ভোটব্যাংক এবং রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় সবাইকে এক ঘরের, এক শ্রেণীর বলে দাবি করছেন।

পরিশেষে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তরপ্রদেশের পিলিভিট। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে প্রায় ৩৭ হাজার উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালির ঠিকানা জোটে সেখানে। জায়গাটাকে অনেকে বলেন উত্তরপ্রদেশের 'মিনি বাঙ্গলা'। বাঙ্গালিরা ওখানে মাছে-ভাতে ভারতীয়। কিন্তু একজন বাঙ্গালিও কোনো অবিশ্বাস-সন্দেহ-ভাষা আক্রমণের শিকার হননি এতগুলো বছরেও। তাই তামিলনাড়ুতে আটক বাংলাভাষী বাংলাদেশি আর প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালির পার্থক্যটা সকলের অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার সময়ে ভাষা-উচ্চারণ-শব্দ নয়, নাগরিকত্বের অনুসন্ধানটাই হওয়া উচিত প্রথম ও প্রধান উপকরণ। মমতা ব্যানার্জি জানেন সেটাই হতে চলেছে। আর জানেন বলেই ভোটব্যাংক এবং নিজের গদি বাঁচাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নেমে পড়েছেন। যেকোনো বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে তিনি খুব ভালো পারেন। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিন্যাস পরিবর্তন যত বেশি হবে, তৃণমূলের ভোট তত বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেই অঙ্কে ওস্তাদ, তাই তিনি তার দুধেল গাই অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশিদের ভোটব্যাংক ও ভোট মেশিনারির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে ভালো জানেন। কে বাঙ্গালি তার বিচার করবেন উনি? ভাবাটাই বোকামি! □

বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ছিলেন অনুপ্রবেশের বিপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশের পক্ষে

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দলের বার্ষিক উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে আসা মানুষেরা নেচে, গেয়ে, বহুরূপী সেজে অনুষ্ঠানটিকে রঙিন করে তুলেছিল। যাঁদের উদ্দেশ্যে এই সভা, তাঁরা হয়তো ভাবতেই পারেননি, তাঁদেরকে নিয়ে এই ধরনের একটা উৎসব হবে। এবার ২১ জুলাই রাজ্যের শাসক দলের কাছে ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। মনে সংশয় ছিল যে ভিড় ঠিক ঠাক হবে তো? ইতিমধ্যেই নানা ভিডিয়োতে সোশ্যাল মিডিয়া ছেয়ে গেছে। সেখানে দেখা গেছে, টাকার বিনিময়ে এই সভায় মানুষজনকে নিয়ে আসা হয়েছে। ওখানে থাকা পুলিশের একটি বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, সভায় অন্য বারের তুলনায় মানুষজন অনেকটাই কম এসেছে। যে মিছিলগুলি বিভিন্ন রাস্তা ধরে এসেছে, সেগুলির কলেবর ছিল অনেকটাই ছোটো। এছাড়াও গাড়ির সংখ্যা আগের তুলনায় বেশ কম। ওই সভায় যারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা গেছে, বাইরে থেকে আসা গাড়িগুলিতে সংখ্যায় লোক ছিল কম। অনেক গাড়ি ১০ থেকে ১২ জন নিয়ে এসেছে। আবার দেখা গেছে সকালে সভাস্থলে মানুষ এসে বেশিক্ষণ থাকেনি। অনেকে অভিষেক ব্যানার্জি ভাষণ শুরু হবার আগেই সভাস্থল ছেড়েছেন। আবার এও দেখা গেছে যে যখন তৃণমূল সুপ্রিমো ভাষণ দিচ্ছেন, সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আসা বহু গাড়ি বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। এবারে আগের রাত্রে বিভিন্ন জায়গায় যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে থাকা রান্নার দায়িত্বে থাকা একটি বিশেষ সূত্র বলছে, গতবারে যে পরিমাণ রান্না হয়েছিল, তাঁর থেকে ২০ শতাংশ কম হয়েছে। এদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ কাঁপিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দরদে গলা ফাটাচ্ছেন, সেই সময়ে কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে, চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়ায়, জাদুঘরে, এমনকী রেসকোর্সের লাগোয়া এলাকায় ভিড় ছিল উপচে পড়া। বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামেও ভিড় ছিল মিছিলে আসা ব্যাচ লাগানো মানুষের। এই সব মানুষদের বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারা গেছে, এরা কেউ এসেছেন জঙ্গলমহল থেকে, বীরভুম থেকে, নদীয়া থেকে, কেউ উত্তরবঙ্গের কোনো জেলা থেকে। নিউ মার্কেটে এদিন জামাকাপড় কেনার ভিড় ছিল খুব। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন অনেক কিছুই। আদতে তাঁর ডাক আর সেই মতো যে কাজে আসছে না, সেটা তিনি এবারে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

> **অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভোটের রাজনীতি সেদিনও করেছিলেন, আজও করছেন।**

সারা রাজ্য থেকে তৃণমূল সমর্থকরা এই বার্ষিক রাজনৈতিক উৎসবে আসেন, মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন, সেটা শোনার জন্য। সামনে নির্বাচন। তাই এবারের এই ২১ জুলাই উৎসব ছিল শেষ উৎসব। ফলে রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার জন্য বেশ কিছু সমর্থক এসেছিলেন। এবারের এই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড (ভাইপো) বাঙ্গালি প্রীতির একটি ইস্যু তুলেছেন। যে ইস্যু অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দেবার জন্য রাজ্য সরকারের উদোগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যে ইস্যু নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে ১৩টি তাজা প্রাণের বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজ সেই অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দিতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। বিশেষ করে সারা পৃথিবীর সমস্যা, সেই রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য। যারা মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে এই দেশে অনুপ্রবেশ করেছে, শুধু তাই নয় বাংলাদেশ থেকে খোলা সীমান্ত দিয়ে

ফঃ ৩

বহু বালাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান এই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছে। তাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড তৈরি হয়ে গেছে শাসক দলের সহযোগিতায়। যেটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

মুখ্যমন্ত্রী আঙুল তোলেন কেন্দ্রের দিকে। কেননা সীমান্ত রক্ষা করেন বিএসএফের জওয়ানরা। কেউ যদি খোলা সীমান্ত এলাকায় গিয়ে থাকেন, দেখবেন যেখানে তারকাঁটার বেড়া নেই, সেই অঞ্চলে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতকারীদের অবাধ আনাগোনা। পাচার নিত্যনৈমিত্তিক একটা বিষয়। আগের বাম সরকারও বেড়া দিতে দেয়নি, এই সরকারও একই পথে হাঁটছে। মানুষ, সোনা, গোরু থেকে ড্রাগ সব এই পথ ধরেই যাওয়া আসা করে। আর অনুপ্রবেশকারীরা আসে এপারের দালাল, ওপারের দালালের সহযোগিতায়। এই প্রতিবেদকের সুযোগ হয়েছিল এই দৃশ্য দেখার। সন্ধ্যা নামলেই বিএসএফ কোনো বাঁশের মাচার মতো চৌকিতে আর থাকতে চান না। তাঁদের জিজ্ঞেস করলে, জানা গিয়েছে, এখানে টহল দেওয়া সম্ভব নয়। ঝুঁকি আছে। না আছে আলো, না আছে বিদ্যুৎ। সেই সুবিধাটুকুও করতে দেওয়া হয়নি বিভিন্ন জায়গায়। সরকার অনুমতিও দেয়নি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেবার। দিনের বেলায় যতটুকু থাকে, সন্ধ্যা নামলে কিছুতেই থাকা সম্ভব হয় না সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। ফলে তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদিকে সীমান্ত লাগোয়া বহু 'নো ম্যানস ল্যান্ড দখল' হয়ে গেছে।

এছাড়াও বহু সরকারি জমিতে বসবাস করছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে এদের নিয়মিত যাতায়াত আছে বাংলাদেশে। এখানে পয়সা দিলে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড পাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই। হাজারো দালাল আছে। এদের সবাই শাসক দলের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত আছে। আর যারা অনুপ্রবেশকারী, তাদের আবার শাসক দলের হয়ে সব থেকে বেশি গলা ফাটাতে দেখা যায় এইসব এলাকায়। এই বিষয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া একটি তথ্যকে মান্যতা দিতেই হবে, গত তিন দশক ধরে এই অনুপ্রবেশ সমস্যা রুখতে বদ্ধপরিকর অসম সরকার। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে অসমের ১০ লক্ষ একর জমি দখল করে নিয়েছে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা। যার ফলে নানা সমস্যা দেখা গিয়েছে অসমে। সেখানেও বাংলাভাষা বলেন অনেকেই। সেখানকার ভূমিপুত্ররা নানা জায়গায় বঞ্চিত হচ্ছেন এদের জন্য।

অন্যদিকে যে অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভোটের রাজনীতি সেদিনও করেছিলেন, আজও করছেন। সেদিন তিনি ছিলেন বিপক্ষে, আর আজ সপক্ষে। এটার সঙ্গে আবার বোকার মতো জুড়েছেন বাংলা বললেই বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট। সারা দেশে বাঙ্গালি হেনস্থার সেন্টিমেন্ট। এই সেন্টিমেন্ট আবার ২০২৬-এর ভোটের ইস্যুও বানিয়ে ফেললেন। সারা দেশে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। পাশের রাজ্য বিহারের ভোটার তালিকা থেকে কয়েক লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। সেখানেও দেখা গেছে বাংলা ভাষায় কথা বলা অনুপ্রবেশকারীরা রয়েছেন। যারা নিজেদের পরিচয়ের বা ভারতের নাগরিকত্বের সঠিক প্রমাণ দিতে পারেননি। দেখা গেছে বিপুল সংখ্যায় রয়েছে রোহিঙ্গা মুসলমান। রোহিঙ্গাদের যদি ইতিহাস দেখা যায় এরা আরাকান হলেও, সিংহভাগ কিন্তু মায়ানমারে গিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে গিয়েছিল সব থেকে বেশি। ফলে এদের অধিকাংশই বাংলা বলে। মায়ানমার সরকারের অর্থনীতিতে প্রবল চাপ পড়েছিল এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। ফলে তাদের বিতাড়নের উদ্যোগ নেয় তারা। এরা সবাই মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বাসিন্দা। এই অনুপ্রবেশকারীদের সেই দেশের সরকার দেশের নাগরিকত্ব তো দেয়নি, উলটো তাঁদের দেশ ছাড়া করতেও পিছপা হয়নি।

ফলে এরা আশেপাশের বিভিন্ন দেশে অনুপ্রবেশ করেছে। আর নিজেদের শরণার্থী হিসেবে সেই দেশের সুবিধা ভোগের দাবি জানাতে থাকছে। এদের জন্য সেই দেশের ওপর অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে। কোনো দেশই এদের নাগরিকত্ব দেয়নি। এমনকী বাংলাদেশও নয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য সরকার এদের জামাই আদরে রাখতে শুরু করেছে। এদের সিংহভাগ বাংলাদেশের বলে এরা বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকে। ফলে রাজ্য সরকারের কাছে এরা বাঙ্গালি। আর এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমান, যারা নদীপথে এই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে, তারা ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। একটি সূত্র বলছে, কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সব অচেনা মুখকে গত নির্বাচনের সময়ে দেখছেন। এমনকী এই সব অচেনা মুখগুলি শাসক দলের ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় মিছিলেও হেঁটেছে।

ফলে এদেরকে নিয়ে বেশিদূর আর অভিযোগের তির এগোননি। সবাই বাংলা ভাষায় কথা বললেও, এরা বাংলাদেশি মুসলমান। এদিকে পাড়ায় পাড়ায় এখন প্যান কার্ড, আধার কার্ড তৈরির দালাল রয়েছে। ফলে পয়সা দিলেই হয়ে যাচ্ছে সব। পশ্চিমবঙ্গ এখন অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গ রাজ্য। বাইরে যে সব বাংলাভাষী অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, তদন্তে দেখা গেছে, এদের আধার কার্ড, ও ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আর সেগুলি ভুয়া নাম, পালটানো নাম দিয়ে। এমনকী দেখা গেছে, একজন মুসলমান, এই রাজ্যে এসে হিন্দু নাম নিয়েছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী যে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের নোংরা খেলা খেলতে চাইছেন, সেটা প্রকারান্তরে এই ভারতে এক বাংলা ভাষীদের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দেবার জন্য, গৃহযুদ্ধ লাগাবার একটা পরিকল্পনা।

শেষে আসি তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের কথায়, তিনি এত বছরের সাংসদ। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, সংসদে ভারতীয় সংবিধানের ১২০ নম্বর ধারায় স্পষ্ট করেই বলা আছে, কেউ যদি হিন্দি বা ইংরেজিতে তাঁর বক্তব্য না রাখতে পারেন, তখন স্পিকার সেই সাংসদকে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেন। ফলে সেকেন্ড ইন কম্যান্ড যে ভুল বোঝাচ্ছেন বা মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন, সেটাই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখলে কেউ তাঁকে থামাবে না, আর বের করেও দেবে না। তাঁর সুবিধা আছে, তাঁর মাতৃভাষা বাংলা। ফলে তার হুংকার যে মিথ্যা সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। অন্য ইস্যু কাজে এল না, তখন বোকার মতো এই ইস্যু নিয়ে এলেন বাঙ্গালি। বাঙ্গালি তাঁর চালাকি ধরে ফেলেছে সেদিনই, যেদিন মুখ্যমন্ত্রী বহিরাগত অবাঙ্গালিকে সংসদে পাঠিয়েছিলেন। □

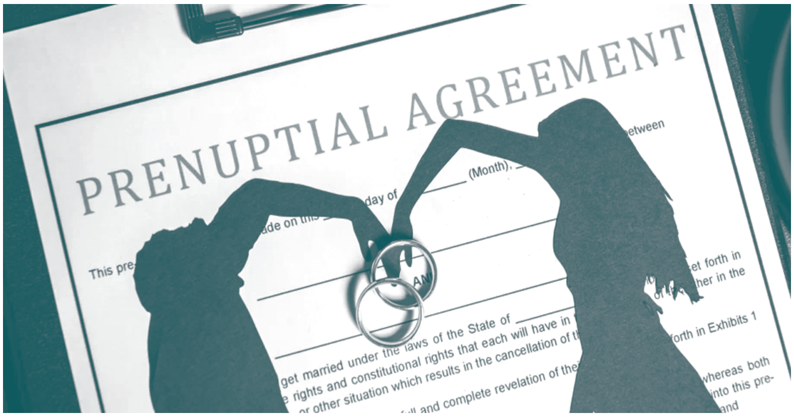

বিবাহপূর্ব চুক্তি এবং সমাজের অবক্ষয়

মৌ চৌধুরি

আমার স্কুলের বান্ধবী মিতার মেয়ের বিয়ের খবরটা পেয়ে ভালো লাগছিল। মিতা জানিয়েছিল ওর মেয়ের আশীর্বাদ আর রেজিস্ট্রি একই দিনে হবে। আর সেই সঙ্গে ওর হবু জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের প্রাক বিবাহ চুক্তি বা (প্রিনাপশিয়াল এগ্রিমেন্ট)-ও সেরে নেওয়া হবে। মিতা আমাকে অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ভাবছিলাম এই প্রিনাপশিয়াল এগ্রিমেন্টের বিষয়টি নিয়ে। এই শব্দবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে নতুন হলেও খুব বেশি অপরিচিত নয়। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মৌটুসী চৌধুরী জানিয়েছেন, এই শব্দবন্ধের বাংলায় অর্থ করলে অনেকটা দাঁড়ায় 'প্রাক বিবাহ চুক্তি'। সহজ ভাবে বলতে গেলে বিয়ের পর কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে নারী কতটা খোরপোশ পাবেন, স্বামীর সঞ্চিত অর্থের ভাগ পাবেন কিনা, স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি কতটা পরিমাণে পাবেন, সন্তান কার কাছে থাকবে ইত্যাদি সাধারণ ভাবে উল্লেখিত থাকে এই চুক্তিতে। পাশাপাশি পুরুষ কী পাবে বা তার আর্থিক সুরক্ষা কতটা থাকবে এই বিষয়টিও লেখা থাকতে পারে। তবে এই প্রিনাপশিয়াল এগ্রিমেন্টে শর্তের বিষয়গুলি নির্ভর করে দুই পক্ষের বোঝাপড়ার উপর। নারী যদি উপার্জনশীল হয়ে থাকেন তবে খোরপোশের বিষয়টি অনেক সময় আদালতের উপর নির্ভর করতে পারে। তবে খোরপোশের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে মহিলারা বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন। বিচ্ছেদের পরেও যাতে মহিলারা এবং তাঁর সঙ্গে যদি সন্তানও থাকে তবে আর্থিক ভাবে যতটা তিনি সম্ভব সচ্ছল থাকবেন সেই দায়িত্ব প্রাক্তন স্বামীর থাকে। এর ফলে পুরুষরা বঞ্চিত হন না এমন নজির নেই। খোরপোশ ও অন্যান্য কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের পর বহু পুরুষ আছেন যাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে আর্থিক ভাবে অসচ্ছলতার ভেতর দিয়ে মানসিক অশান্তি সহ্য করে দিন যাপন করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এই প্রিনাপশিয়াল এগ্রিমেন্টের ফলে নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়তো বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবনা থাকে না। কিন্তু এর ফলে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন, সাংসারিক নৈকট্য বা সন্তানকে ভারতীয় আদর্শে প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তীব্রভাবে ব্যাহত হতে পারে।

মনোবিদ অনন্যা চক্রবর্তী মনে করেন এই চুক্তির ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সাংসারিক জীবন ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ এই চুক্তি নারীদের কতটা সামাজিক সুরক্ষা দেবে তা বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু এই এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যেন বিয়ের আগেই ডিভোর্সের 'প্ল্যান' ছকে ফেলা হলো। তিনি বলেন, এখন মহিলারা প্রায় অনেকেই উপার্জনশীল। স্বভাবতই কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে তাদের যেতে হয়। পাশাপাশি প্রচুর নারী আছেন যারা উপার্জন করুন বা নাই করুন বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি থাকতে চান না। এমনও নজির আছে বিয়ের অষ্টমঙ্গলার আগেই পৃথক সংসার গড়ে তুলেছেন অনেক মহিলা। সম্পর্ক গড়ে তোলার আগেই সম্পর্ক ভাঙার চুক্তিতে স্বাক্ষর করা তারই আরেক উদাহরণ। এই ধরনের মানসিকতার মহিলারা এবং উপার্জনশীল অনেকেই যারা বিবাহকে ছেলেখেলা মনে করেন তারা এই ধরনের চুক্তিতে বেশি আগ্রহী বলে মনে করেন আইনজীবী মৌটুসী এবং মনোবিদ অনন্যা। মূলত ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি চূড়ান্ত করতেই এই চুক্তিতে আগ্রহী হয় তারা। তাঁরা বলেন, দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে অনেক বড়ো মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি, দীর্ঘকালীন ঝামেলা এড়াতে এবং অন্যান্য কারণে পুরুষেরাও এই চুক্তিতে আগ্রহী হচ্ছেন।

সমাজ বিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য বলেন, মানতেই হবে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ক্যারিয়ারমুখী জীবনের কারণে এই পরিবর্তনের বাইরে কেউ থাকতে পারবে না। এই পরিবর্তনের অপর নাম আধুনিকতা বলে কিনা জানা নেই তবে পুরনো সব খারাপ এই ধারণা অতীব ভ্রান্ত। তিনি মনে করেন ভারতের ঘরে ঘরে বৈদিক সভ্যতারও আগে থেকে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা, আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করেই সংসার গড়ে উঠেছে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যুগে যুগে মহামানবরা জন্ম নিয়েছেন এই দেশে। ভারতে শিক্ষিতা মহিলা কোনোদিনও কম ছিল না। দেশে ইসলামি শাসনের শুরু থেকে ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছুটা ভাটা পড়েছিল ঠিকই কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ভাবনার ব্যাপকতা ছিল না। তাঁর মতে বিবাহ বিচ্ছেদ বা প্রিনাপশিয়াল এগ্রিমেন্ট ভবিষ্যতের পথে কিছুতেই সমাধান হতে পারে না। সংসার সুখের হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশের সম্পদ হবে।

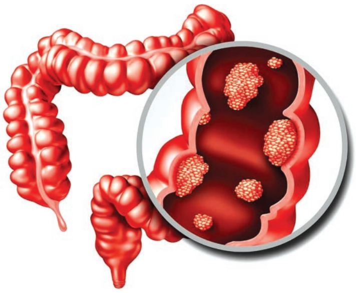

রেক্টাল ও কোলন ক্যানসারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ক্যানসারের স্থান দ্বিতীয়। ২০১৮ সালের সর্বশেষ তথ্য মতে পৃথিবীতে ৯৬ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এখনই প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা না নিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা হবে দ্বিগুণ। আশার কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে যত মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে, তার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ক্যানসারই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ক্যানসারের প্রকারভেদ : প্রতিবছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। সাধারণত ফুসফুস, কোলন, রেক্টাল, স্তন, জরায়ু ক্যানসারে বেশি আক্রান্ত হয়।

কোলন ও রেক্টাল ক্যানসার : পরিবেশ অথবা বংশগত প্রভাবের কারণে মলাশয়ের মিউকাস এপিথেলিয়ামের টিউমারটি ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে পরিণত হলে তাকে কোলন বা মলাশয়ে ক্যানসার বলে। এটি সাধারণত মলাশয় ও মলদ্বারের সংযোগস্থানে বেশি হয়।

লক্ষণ : প্রাথমিকভাবে কোন জায়গায় ক্যানসার রয়েছে তার তেমন কোনো উপসর্গ বোঝা যায় না। কোলন বা মলাশয়ের কোন জায়গায় ক্যানসার রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে উপসর্গে বিভিন্নতা দেখা দেয়। পায়খানার সঙ্গে রক্ত কিংবা পেটে ব্যথা নিয়ে বেশিরভাগ রোগী প্রথম চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। রোগটির ক্ষেত্রে মলত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন (কখনো ডায়রিয়া, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য), রক্তশূন্যতা (দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট) ঘটে। অবস্থা গুরুতর হলে ওজন কমে যাওয়া, পেটে ব্যাথা, পেটে জল, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা বা তাজা রক্ত ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত চিকিৎসকরা রোগীদের রোগটির অতিমাত্রায় অগ্রসর অবস্থায় পান। কারণ বেশিরভাগই রোগীই আসে অপচিকিৎসার শিকার হয়।

ক্যানসারের কারণ :

বয়স : কোলন ক্যানসারে ভোগা প্রতি ১০ জনের ৯ জনে বয়স ৬০ বা তার বেশি।

খাদ্যাভ্যাস : ভাজা-পোড়া, অতিরিক্ত রেড মিট, ডিডিটি মিশ্রিত শুঁটকির আধিক্য এবং ফাইবারযুক্ত মিশ্রিত খাবারের অনুপস্থিতি।

ওজন : অতিরিক্ত ওজন যাদের তাদের কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

পারিবারিক ইতিহাস : বংশগত কারণে জিনের পরিবর্তন বা জেনেটিক মিউটেশন হতে পারে। পরে তা কোলন ক্যানসার ত্বরান্বিত করে। এছাড়া রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় পরিজন কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত থাকলে কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ধূমপান ও মদ্যপান : ধূমপান ও মদ্যপান কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

করণীয় : প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এটি অনেকাংশে নিরাময়যোগ্য। এমনকী ক্যানসার যদি কাছাকাছি লসিকাগ্রন্থিতেও ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সার্জারি পরবর্তী কেমোথেরাপি মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পঞ্চাশোর্ধ্ব সব জাতি-বর্ণের নারী-পুরুষ কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। মনে রাখতে হবে, স্ক্রিনিঙের মাধ্যমে ক্যানসার পূর্ববর্তী পলিপস শনাক্ত করে অপসারণের মাধ্যমে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব। পাশাপাশি স্ক্রিনিঙের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্ত করে প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকৃত এসব পলিপস, যা বিস্তৃতি লাভ করেনি বা ছড়িয়ে পড়েনি সেগুলো অপসারণের মাধ্যমে পুনরায় সুস্থ জীবন যাপন করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

চিকিৎসা : সম্পূর্ণ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণই হলো কোলন ক্যানসার চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত রোগীর শারীরিক অবস্থা, টিউমারের অবস্থান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে—সার্জারি। রেডিয়োথেরাপি, কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, হোমিওপ্যাথি।

অপচিকিৎসা নয় : ক্যানসার কঠিন রোগ হলেও এর উপযুক্ত চিকিৎসা রয়েছে। রোগীদের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাধুনিক চিকিৎসার যুগে এসেও মানুষ এখনো হাকিম, কবিরাজ, ঝাড়ফুঁকের ওপর বিশ্বাস করে। রোগীদের প্রতি অনুরোধ, কোনো রোগ সম্পর্কে পরিচিত জনের পরামর্শ না নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এক্ষেত্রে রোগীর সচেতনতাই ক্যানসারকে প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করতে সাহায্য করবে। কাজেই সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন।

প্রতিরোধের উপায় : স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান। লাল মাংস রেডমিট কম খান বা পরিহার করুন। ৫০ বছর বয়সের পর স্ক্রিনিং করান। ধূমপান বর্জন করুন। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। ফরমালিনমুক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করুন।

যে কোনো ক্যনসার রোগের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে সম্ভব। □

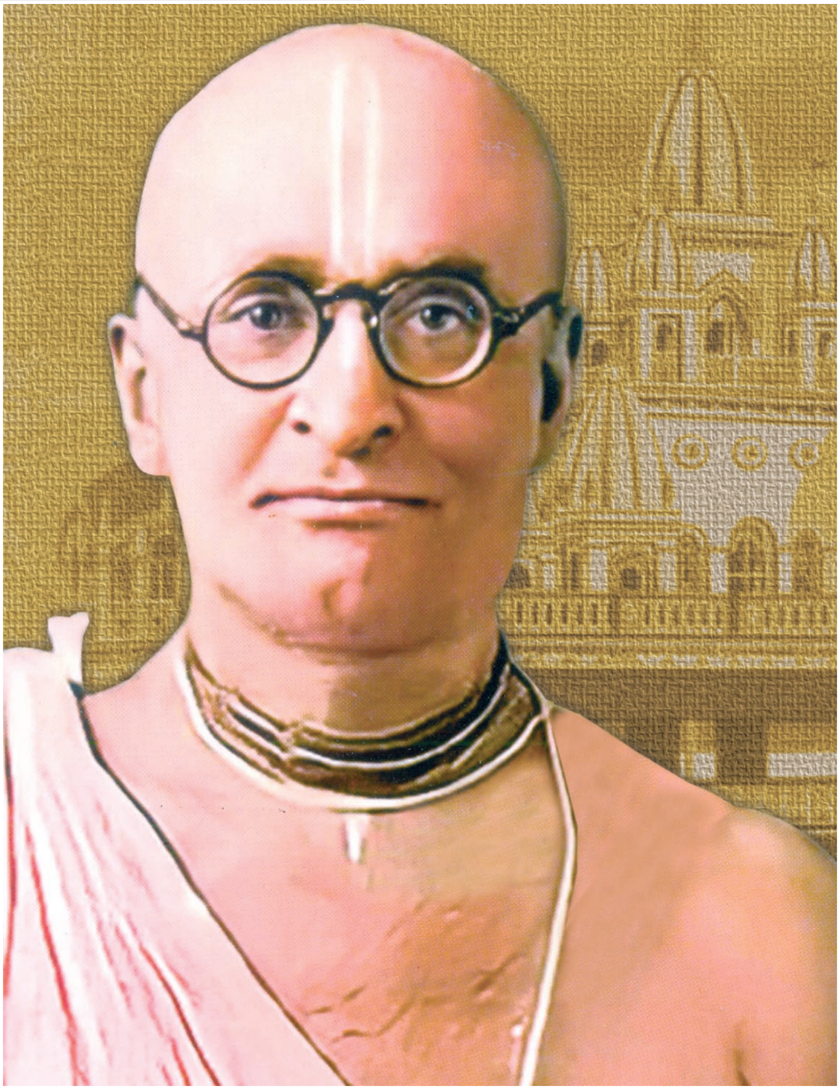

লাইব্রেরির সমস্ত প্রকার শাস্ত্র অনুশীলন করেন। তিনি ছোটো থেকেই নিষ্ঠাবান, ধর্মানুরাগী ও সদাচারী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। জাগতিক জ্ঞান অর্জনে বিশেষ তৎপর না হয়ে কিছুদিন ত্রিপুরা এস্টেটে কর্ম করার পর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় সদগুরুর দর্শন পান। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ পরীক্ষা নিয়ে ১৯০০ সালে জানুয়ারী মাসে ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করেন। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের প্রচার অভিলাষ বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বিপুল উদ্যমে প্রচার শুরু করেন। তিনি কিছুদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ওড়িশার বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন। তিনি চিরদিনই সত্যের নির্ভীক বক্তা ছিলেন। ভক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও অশাস্ত্রীয় কথার চিরদিনই প্রতিবাদ করেছেন। কর্মজড়-স্মার্তবাদ ও শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্মের নামে যত অপসম্প্রদায় ছিল তাদের মতবাদকে খণ্ড-বিখণ্ড করে শুদ্ধভক্তির ধারা পুনরায় জগতে প্রচার করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (১৮৭৪–১৯৩৭)

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞান দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্তুতে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত হারিণে॥

পরিচয় : গৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যোগ্য সন্তানরূপে ১৮৭৪ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীধামে পুরীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে 'নারায়ণ ছাতা'য় শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভূত হন। মাতা শ্রীভগবতী দেবী বিমলাদেবীর প্রসাদ দ্বারা অন্নপ্রাশনকালে এঁর নাম 'বিমলাপ্রসাদ' রাখেন। কিছুদিন পরে রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ দেব নিজ প্রসাদী মাল্য দ্বারা কৃপাভিষিক্ত করেন। বিদ্যাবিলাসকালে ঠাকুরের আদেশে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে চাতুর্মাস্য ব্রতকালে শতকোটি নামযজ্ঞ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির প্রচার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। ওই সময় পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর ও সকল শ্রীগুরুবর্গ স্বপ্নের মধ্যে দিব্য মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে শ্রীল

প্রভুপাদকে পূর্ণ উদ্যমে শুদ্ধভক্তি প্রচার কার্যে অগ্রসর হবার নির্দেশ প্রদান করেন। এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই পিছন থেকে তাঁকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৮ সালে ২৭ মার্চ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস লীলা আবিষ্কার করেন এবং সেই সময় 'শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ' নামে অভিহিত হন। তারপর চৈতন্য মঠ স্থাপন পূর্বক একে একে ভারতের সর্বত্র প্রায় ৬৪টি গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে বহু বৈষ্ণব ধারায় এবং বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ পূর্বক সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন স্থানে বিগ্রহ স্থাপন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর প্রচার বৈশিষ্ট্যের কোনো তুলনা নেই।

অবদান বৈশিষ্ট্য :

১. শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হয়ে অর্চনপ্রধান পঞ্চরাত্র এবং কীর্তন প্রধান ভাগবতের সমন্বয় গুরু ছিলেন।

২. তিনি দৈববর্ণাশ্রমের মর্যাদা সংস্থাপন, যুক্তবৈরাগ্যের আদরকারী এবং বিধির আকারযুক্ত রাগমার্গীয় অনুশীলনকারী শিক্ষক ছিলেন।

৩. তিনি 'কীর্তনীয় সদা হরি'— এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে হরিকীর্তনময়

শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজ

মঠ-মন্দির স্থাপন পূর্বক গৃহী, ত্যাগী সকল শ্রেণীর ভক্তের আশ্রয়দাতা ও সেবাদাতা রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

৪. শ্রীনবদ্বীপধামে পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং দেশে দেশে, গ্রামে-গঞ্জে প্রচারক পাঠিয়ে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৫. কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠায় অনাদর প্রদর্শনপূর্বক তিনি অকিঞ্চন ভগবৎ ভক্তের শুদ্ধদাসত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৬. শুদ্ধ রূপানুগ ধারার সংরক্ষণপূর্বক তিনি শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত সম্পূর্ণরূপে দলন করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বার্তা :

উপদেশ বা বাণী :

১. বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সবই তার ভোগ্য।

২. হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

৩. শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার—দুই একই।

৪. সহ্য করতে শেখা মঠবাসীর একমাত্র কর্তব্য।

৫. শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্'—ই শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

৬. আমরা সৎকর্মী, কুকর্মী বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্তনীয় সদা হরি' মন্ত্রে দীক্ষিত।

৭. রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোনো লালসা নেই।

৮. কেবল আচরণ রহিত প্রচার কর্মাঙ্গের অন্তর্গত।

৯. কৃষ্ণেতর সংগ্রহই আমাদের মূল দাবি।

ঘটনাবলী :

১. ১৯১৬ সালে ২৭ মার্চ কীর্তন প্রচারাঙ্গরূপে ভাগবত মুদ্রায়ন কৃষ্ণনগরে প্রথম স্থাপিত হয়। উহাই পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে বৃহৎমৃদঙ্গযন্ত্রালয় রূপে

কলকাতা বাগবাজার মঠে পুনঃস্থাপিত হয়।

২. ১৯১৮ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে চৈতন্যমঠ স্থাপন করেন।

৩. ১৯১৮ সালে ১৮ এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে আলাপ হয়।

৫. ১৯৩০ সালে কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়।

৬. ১৯৩১ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে পারমার্থিক শিক্ষার অনুকূলে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট' স্থাপিত হয়।

৭. ১৯৩৪ সালে ২৪ এপ্রিল ভারতসচিব জেটলান্ডের সভাপতিত্বে 'লন্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি' স্থাপিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ সম্পাদিত পত্রিকা :

১. ১৮৮১ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা প্রথম 'সজ্জনতোষণী' বা 'The Harmonist' রূপে প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভু পাদ ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে পুনঃস্থাপন করেন।

২. ১৯২২ সালে ১৯ আগস্ট কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে পারমার্থিক পত্রিকা রূপে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।

৩. 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা রূপে শ্রীধাম মায়াপুর প্রকাশিত হতে প্রকাশিত হয়।

৪. 'ভাগবত' ১৯৩১ সালে ৮ নভেম্বর শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠ হতে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

৫. 'কীর্তন'-১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অসম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হতে শ্রীল প্রভুপাদ অসমীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করেন।

৬. 'পরমার্থী' কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হতে উৎকল ভাষায় ১৯৩২ সালে ১৬ মে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ■

শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে উক্তি

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি :

'দেখুন, সরস্বতী কীরূপ সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া একান্ত মনে শ্রীধাম মায়াপুরে দশাপরাধশূন্য শ্রীনামের ভজন করিতেছে। আপনারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করুন।'

—(সরস্বতী জয়শ্রী ২৪ বৈভব)

'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম এবং শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ সংস্থাপন পূর্বক বৈষ্ণব জগতের শুদ্ধনাম প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্যে তিনি গৌরসুন্দরের ভারপ্রাপ্ত।'

—(সরস্বতী জয়শ্রী ২৪ বৈভব)

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের উক্তি :

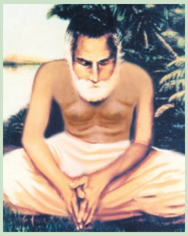

'আপনি সর্বদা সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিবেন। তিনি আমার গুরু এবং আদর্শ বৈষ্ণব। দেখুন, তিনি রাজার ছেলে হইয়াও কীরূপ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রবর্তন করিয়াছেন। সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর আশ্রয়ে একান্তভাবে নামসেবা করিতেছেন। তাঁহার বৈরাগ্য অতুলনীয়; তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের ও আমার মহাপ্রভুর নিজজন।'

—(সরস্বতী জয়শ্রী ২৪ বৈভব)

শ্রীল গুরুমহারাজের উক্তি :

'শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞান দায়ী, গৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহ, গৌরবাণীর মূর্তি, মঠ-মিশনাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদের অধিকারোচিত ভজনের সুযোগ দান আদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।'

—(সরস্বতী গুরুমহারাজের দীনপঞ্জি ২৩।২।৫৩)

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রোক্তি :

১. বহুলোকের নিকট হরিকথা বলিতে বলিতে দুই একজন ভালো লোকও ভগবৎ কথায় মনোযোগী হইতে পারেন— ইহাই আমার আশাবন্ধ।

—(সরস্বতী জয়শ্রী হতে ইং ২৫।৫।৩৩)

২. ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবৎ ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠানো যায়।

—(সরস্বতী জয়শ্রী হতে ইং ২৩।২।৩৪)

শ্রীল প্রভুপাদের স্বউক্তি :

১. সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবেন। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জড়ীয় ইন্দ্রিয় তর্পণে কোনো ব্যক্তি বা সমাজবিশেষে কোনো মঙ্গল লাভ হইবে না।

—(সরস্বতী জয়শ্রী ১৪৭ পৃ:)

২. হৃদয়ে বরিল কেবা দয়িত দাসের সেবা
গোপীধন কথার কীর্তন।

(গৌড়ীয় মিশন থেকে সংগৃহীত)

রথীন্দ্র মঞ্চে রাম শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

গত ২৯ জুলাই কলকাতা জোড়াসাঁকো রথীন্দ্র মঞ্চে রাম শরদ স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে কলকাতা জোড়াসাঁকো রথীন্দ্র মঞ্চে রাম শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান-২৫ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী সজ্জন তুলস্যান। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন যথাক্রমে বনবন্ধু পরিষদের জয়দীপ চিৎলাঙ্গিয়া এবং কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগিনী পূর্ণিমা কোঠারী। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। এছাড়াও মঞ্চাসীন ছিলেন রাম শরদ স্মৃতি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ রাজেশ অগ্রওয়াল (লালা)। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার সদস্য শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। মঞ্চাসীন অতিথিদের পরিচয় ও বরণের পর স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার সচিব রজত চতুর্বেদী।

এবছর রাম শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান তিনজনকে প্রদান করা হয়। প্রথনজন ওড়িশার বালি শিল্পী পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনায়েক। শ্রীনায়েক একজন স্বভাবশিল্পী। বাল্যকাল থেকেই সমুদ্রতটে বালি দিয়ে শিল্পকর্ম করতে ভালোবাসেন। সমাজ জাগরণে উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্রতটে বালি দিয়ে খেলা, পরিবেশ সচেতনতার বিষয়ে হাজার হাজার চিত্র এঁকেছেন। এজন্য তিনি দেশ-বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়জন কোচবিহার শহরের বিনয় দাস। বৃক্ষরোপণে তাঁর বিশেষ রুচি রয়েছে। এপর্যন্ত তিনি ১২ হাজারেরও বেশি আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আমলকি, নিম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে বড়ো করেছেন। তিনি এলাকায় 'গ্রিন বিনয়' নামে পরিচিত।

তৃতীয়জন রাজস্থানের বীরমাতা শ্রীমতী অক্ষয় দেবী মাহেশ্বরী। শ্রীমতী মাহেশ্বরীর পুত্র অবিনাশ মাহেশ্বরী ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। মঞ্চাসীন অতিথিগণ তিনজনকেই পুষ্পস্তবক, শাল, উত্তরীয়, পঞ্চফল এবং রাম শরদ কোঠারী ভ্রতৃদ্বয়ের প্রতিকৃতি এবং ২১ হাজার টাকার চেক প্রদান করে সম্মানিত করেন। এরপর সংস্থার সদস্য পঙ্কজ চৌধরীর একক গীতের পর বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামমন্দির মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং করসেবকদের ভূমিকা বিশেষ করে রাম ও শরদ কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের বলিদানের কথা আবেগমথিত কণ্ঠে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাম শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উপাধ্যক্ষ সঞ্জয় মণ্ডল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অন্যতম উপাধ্যক্ষ শ্রীমতী অনিতা বুবনা। বন্দেমাতরম সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গাজোলে সাধু-সন্ন্যাসী ও গুণীজন সংবর্ধনা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে গত ২৪ জুলাই মালদা জেলার গাজোলে বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের উদ্যোগে স্থানীয় পালকি লজের সভাকক্ষে সাধু-সন্ন্যাসী এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কমরত গুণীজন সংবধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু ইসকন ভক্ত, মতুয়া ভক্ত, বৈষ্ণবভক্ত এবং সমাজের পুরোহিতগণ। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বানন্দ মহারাজ এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁওতাল গুরুমা কমলী সোরেন। ছিলেন সংস্কার ভারতীর মালদা জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত টোলির সদস্য নিখিল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সাধু-সন্ন্যাসী ও গুণীজনকে মালা ও শাল পরিয়ে শ্রীগীতা ও মিষ্টি প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় যোগগুরু শ্যামল মণ্ডল, বিশিষ্ট তিরন্দাজি হোপা হেমরম এবং তাইকুন্ডু গুরু তপেশ বরাহুড়ীকে। রবিদাস সমাজ থেকে আগত সবাইকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রতাপ সিংহ, ইসকনের দিলীপ সাহা, মতুয়া মহাসঙ্ঘের হরিপদ ঢালী, স্বপন মিশ্র ও দয়াল বাবা, সৎসঙ্গের নিরঞ্জন মজুমদার এবং রামরঞ্জন দাস।

সংস্কার ভারতীর নটরাজ পূজন এবং গুরু বন্দনা অনুষ্ঠান

গত ১০ জুলাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ) বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করে সংস্কৃতির আদিগুরু নটরাজের স্মরণে নটরাজ বন্দনা এবং সনাতন সংস্কৃতির ধারক বাহক শিল্পীদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান।

এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংস্কার ভারতী নটরাজ বন্দনা ও শিল্পী সম্মাননা দিবসের আয়োজন করে গোবরডাঙ্গা সমাদ্দার পাড়ার বোধন সেবাকেন্দ্রে। সংগীত শিল্পী মানস মণ্ডল এবং যন্ত্রানুসঙ্গ শিল্পী বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে শিল্পী সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

হাওড়া গ্রামীণ ক্ষেত্রে বাগনানের সরস্বতী আশ্রমে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে নটরাজ বন্দনা ও শিল্পী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানে বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী ও শ্রীরামমূর্তি নির্মাণে খ্যাত বাবলু পালকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নদীয়া জেলার বারহুইদা, কৃষ্ণনগরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এখানে বিশিষ্ট নাগরিক, কবি, সংস্কার ভারতীর প্রবীণতম কার্যকর্তা বিজনকৃষ্ণ কুণ্ডুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা এই অনুষ্ঠান পালন করে দেশপ্রিয় পার্কের সন্নিকটে মাতৃমন্দিরে। এখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষকে শিক্ষাগুরু হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উত্তর কলকাতা জেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বয়েজ ওন হলে। এখানে মহানাম অঙ্গনের শ্রীমৎ বন্ধুসুন্দর ব্রহ্মচারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী দেবাদিদেব নটরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ রাখেন।

মেদিনীপুর জেলার সদস্যরা আশিস সিংহের বাড়ির নাটমন্দিরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এখানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী গোপাল চন্দ্র নাগকে জেলার পক্ষ থেকে শিল্পী সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বাঁশবেড়িয়ায় গন্ধেশ্বরী নাটমন্দির প্রাঙ্গণে হুগলী জেলা আয়োজন করে এই অনুষ্ঠানের। এখানে বিদ্যাবিহার মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় আমন্ত্রিত নৃত্যগোষ্ঠী মেঘমল্লার কালচারাল সোসাইটি এবং পায়েল ডান্স ইনস্টিটিউটের নিবেদন সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সোনারপুরের ঋদ্ধি-সিদ্ধি ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কথক নৃত্যগুরু সন্দীপ মল্লিক এবং প্রসিদ্ধ তবলাবাদক রঘুনাথ নন্দীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.জয়ন্ত রায়চৌধুরী, রাজপুর বিদ্যানিধি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. পার্থসারথি দাস এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অশোক ঘোষকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বীরভূম জেলার সিউড়ী রবীন্দ্র সদন মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে প্রখ্যাত কীর্তনশিল্পী অনাথবন্ধু ঘোষকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী রতন কাহার এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অনাথবন্ধু ঘোষের গৌরচন্দ্রিকা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে।

বর্ধমান জেলার অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সায়ন্তী ভট্টাচার্যকে শিল্পী সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আদিগুরু নটরাজ পূজনের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন চন্দন সাহা।

বাঁকুড়া জেলার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বাঁকুড়া শহরের রামপুরস্থিত পাঞ্চজন্য ভবনে। এখানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, সংস্কার ভারতীর প্রান্ত অধিকারীগণ বিভিন্ন জেলার অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষক রূপে উপস্থিত ছিলেন।

ফঃ ৪

নদীয়ার ফুলিয়ায় স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলন

গত ২০ জুলাই নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় ফুলিয়া শিক্ষা নিকেতনের সভাকক্ষে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলা সঙ্ঘচালক উত্তম ঘোষ, অধ্যাপক সঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অরুণ ভৌমিক এবং কৃষ্ণনগর শঙ্কর মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্কর শুদ্ধানন্দজী মহারাজ। বক্তাগণ স্বস্তিকা পাঠকদের বিভিন্ন মনোগ্রাহী অনুভব সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি সকলকে স্বস্তিকার গ্রাহক হতে আগ্রহ করেন। কল্যাণমন্ত্র উচ্চারণের পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধার ১৬১তম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১৯ জুলাই বীরভুম জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রদ্ধা তাদের ১৬১তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ীর ভট্টাচার্য পাড়ার প্রবীণ নাগরিক দিলীপ কুমার মজুমদারকে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি দিয়ে শ্রীমজুমদারকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। মাল্যদান করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন সন্তোষ রায়। পূজা করেন ছোটো বউমা সঞ্জু মজুমদার। সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা ও মিষ্টি প্রদান করেন সংস্থার অনুভবী জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন সুব্রত নন্দন এবং নাতি সপ্তর্ষি মজুমদার। অনুভব কথন শোনান প্রবীর মজুমদার, জয়দেব মজুমদার এবং প্রধান শিক্ষক আশিস অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মণিদীপা মুখোপাধ্যায় এবং ফাল্গুনী মিশ্র। কৃতজ্ঞতা জানান ইন্দ্রজিৎ দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

পূর্ণকালীন স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণীর প্রতি আহ্বান

'অপরের সেবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, অনুগত— এমন যুব সম্প্রদায়ের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। আমার আদর্শ রূপায়ণে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের কল্যাণ এবং একই সঙ্গে বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রেরও কল্যাণকারী হবে'— স্বামী বিবেকানন্দ

- স্বামীজী যেরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন সেইভাবে দেশসেবার কাজে আপনার কি আগ্রহ আছে?
- আপনি কি রাষ্ট্রের উত্থান দেখে, সাফল্য দেখে আনন্দিত হন? সাধারণ মানুষের সংগ্রামে ব্যথিত হন? আপনি কি গ্রাম ও বস্তিতে নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের জন্য সেবাকাজে ইচ্ছুক? আপনি কি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে চান?
- যোগ জীবন চলার এক পথ— আপনি কি এই বিষয়ে জানতে, অভ্যাস করতে, প্রচার করতে আগ্রহী?
- আপনি যদি অবিবাহিত, উদ্যমী তরুণ বা তরুণী হন, ঘর, পরিবার ছাড়তে প্রস্তুত থাকেন, রাষ্ট্রসেবার কাজে, দেশের কাজে যে কোনো প্রান্তে যেতে রাজি থাকেন, কেন্দ্র আপনার থাকা খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করবে।
- যদি প্রস্তুত থাকেন কমপক্ষে দু-বছরের জন্য পূর্ণকালীন, নিবেদিতপ্রাণ, অবৈতনিক কার্যকর্তা হিসেবে যোগদানের জন্য তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত

X3, First Floor, ৭৬/২, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মোবাইল : ৯৪০৩৬২৫২২৩ / ৯৮৩০২৩৩৮১৪

Kolkata@vkendra.org

INTO
YOUR
LIFE
SURYA
INTO YOUR LIFE, WE BRING LIGHT, WARMTH, & STRENGTH.
INTO YOUR LIFE, WE BRING SURYA ROSHNI.
Surya Roshni is the trusted companion bringing light, warmth, and care to every moment.
From purity in every sip to safe spaces, we bring innovation and reliability into your life.
Let's brighten up your world together!
Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting
I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya | surya_roshni | surya.roshni | surya-roshni
Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

বৈদ্যনাথ কেবল মহা শিবতীর্থ নয়, বৈদ্যনাথ আবার শক্তিপীঠও। সুদর্শন চক্রে খণ্ডবিখণ্ডিত সতীর হৃদয় পড়েছিল এই বৈদ্যনাথে। সে কারণে এটি একান্ন সতীপীঠের অন্যতম। আর সে কারণেই একই সঙ্গে শিব ও শক্তির আরাধনার জন্য ভক্তরা ছুটে আসেন বৈদ্যনাথ ধামে।

বোল ব্যোম
কাঁওর নিয়ে বৈদ্যনাথে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শ্রাবণধারা অবিরাম। তারই মধ্যে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন অগণন মানুষ। সতত দক্ষিণ-পূর্বে প্রবহমান গঙ্গা এই সুলতানগঞ্জে এসে উত্তর প্রবাহিনী। বিহারের ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জের বর্তমান নাম অজগৈবীনাথ ধাম। গঙ্গোত্রী থেকে সমতলভূমে প্রবাহিত গঙ্গার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণ-পূর্বে। উত্তরে প্রথম বাঁক হরিদ্বারে। তারপর দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা উত্তরপ্রদেশের কাশীতে এসে উত্তরবাহিনী। সেখান থেকে এগোতে এগোতে ভৃগু থউরায় আবার উত্তরমুখী। উত্তরপ্রদেশের সীমানা পেরিয়ে বিহারে ঢুকে গঙ্গা ফের উত্তরে বাঁক নেয় পাটনার কাছে রাঢ় ও মুঙ্গেরে। সেখান থেকে ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জে উত্তরবাহিনী গঙ্গার বুকে এক শৈলময় দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অজগৈবীনাথ শিবমন্দির। অপার মহিমা এই শিবমন্দরের। সতত গঙ্গাধারায় নিস্নাত এই মন্দির।

সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী অজগৈবীনাথের শিব স্বয়ম্ভু। এই শিবের নামকরণের উৎস সম্পর্কে বলা হয় অজ ও গৈবীনাথ এই দুই শব্দের মিলনে স্থানের নাম অজগৈবীনাথ ধাম। অজ শব্দের অর্থ জন্ম রহিত বা অজেয় এবং গৈবীনাথ হলো শিবেরই একটি নাম।

শ্রীরামের পূজিত শিব

এই তীর্থ ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ত্রেতাযুগে। পৌরাণিক কাহিনি, রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে শ্রীরামচন্দ্র এখানেই শিবের আরাধনা করেন। এই মন্দির ছিল প্রাচীন ঋষিদেরও তপস্যার স্থল।

অজগৈবীনাথ শিবের মন্দিরটি পাথরের তৈরি। নাগরশৈলীতে তৈরি মন্দিরটি শতাব্দীর পর শতাব্দী নদীস্রোত, বন্যা ও খরা সহ্য করে আজও সেরকম অক্ষত অবিচল— সেটা ভারতীয় ভাস্কর্যের এক বিস্ময়। নৌকার মতো আকারের এই শিবমন্দিরে বিভিন্ন প্রাচীন দেব-দেবীর যেসব খোদাই ও প্রতীক রয়েছে তা প্রাথমিকভাবে এই মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন রাজবংশের পরিচয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অজগৈবীনাথ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নানা লোককাহিনি। বলা হয়, স্বয়ং শিব এই স্থানটিকে তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেছে নেন। এখানে তিনি বিরাজমান অনাদিকাল থেকে।

বলা হয়, এখানেই ছিল জহ্নুমুনির আশ্রম। মাগঙ্গা চপলতার বশে তাঁর আশ্রমটি ভাসিয়ে নিতে গেলে জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গিলে ফেলেন। পরে ভগীরথের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তাঁর জানুদেশ দিয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সে কারণেই গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। সব মিলিয়ে মহাপুণ্যতীর্থ এই অজগৈবীনাথ ধাম সাধকদের সাধনার এক পুণ্যক্ষেত্র।

অজগৈবীনাথ সম্পর্কে এত কথা বলার অন্যতম কারণ, শ্রাবণ মাসে এই পুণ্যধাম থেকেই গঙ্গাজল বাঁকে করে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার দূরে বৈদ্যনাথ ধামে হেঁটে নিয়ে যান পুণ্যার্থীরা। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে বৈদ্যনাথ ধামে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী যেভাবে গঙ্গাজল নিয়ে যান, তা 'কাঁওর যাত্রা' নামেও প্রসিদ্ধ।

হলাহলের জ্বালা কমাতেই

সমুদ্র-মন্থনের সে এক প্রলয়লগ্ন। অমৃতের পরিবর্তে উঠল হলাহল। বাসুকীর চোখ-মুখ দিয়ে নির্গত বিষবাষ্পে হতচেতন প্রায় দেবতা ও অসুররা। মন্থনরজ্জু বাসুকী যে হলাহলের কারণ একথা জানা থাকলেও ব্যাপারটা উপেক্ষা করেছিল সুরাসুর উভয়েই। অথবা সেটাই ছিল অনিবার্য। এবং সেটাও ছিল বিষ্ণুর এক কূটচাল।

শ্রীবিষ্ণু জানতেন, মন্থনের সময় বাসুকীর মুখ থেকে নির্গত হবে হলাহল। তাই অসুরদের বিভ্রান্ত করতে মন্থনের সময় দেবতাদের নিয়ে তিনি ধরেন বাসুকীর মাথার দিকটা। অসুররা ভাবে সাপের লেজের দিকটা অশুভ। তাই তাদের সমবেত প্রতিবাদ, এ হবে না, বাসুকীর মুখের দিকটা ধরবে তারা।

এটাই তো চাইছিলেন বিষ্ণু। তাই কোনো তর্কে না গিয়ে বলেন, বেশ তাই হোক। দেবতারা ধরলেন বাসুকীর লেজের দিক আর অসুররা মুখের দিক। তাই বাসুকীর মুখ থেকে নির্গত হলাহলে অসুররাই হতচেতন হয়।

তবে একা অসুররা নয়, সারা বিশ্বচরাচরই যেন নীল হয়ে ওঠে বিষে। জগৎকে বাঁচাতে মহাদেব পান করেন সেই হলাহল। বিষের ক্রিয়ায় নীল হয়ে যায় তার কণ্ঠ। তাই তাঁর নাম হয় নীলকণ্ঠ।

হলাহল থেকে রক্ষা পেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু বিষের জ্বালায় জ্বলতে থাকে শিবের দেহ। তাঁর সেই জ্বালা কমাতে তাঁর ভক্ত রাবণ বাঁকে করে গঙ্গাজল এনে ঢালেন রামেশ্বরে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মাথায়। উপশম হয় সব জ্বালার। সেটা ছিল একটা শ্রাবণ মাস।

পুরাণ কথা, তারপর থেকেই শুরু শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জলঢালার বা শিবের জলাভিষেকের জন্য শিবভক্তদের এই 'কাঁওর যাত্রা'। জল আনার এই পদযাত্রায় এখন যোগ দেন ভারত ও নেপালের লক্ষ লক্ষ শিবভক্ত। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০২৩ এবং ২০২৪-এ হরিদ্বারে শিবের এই জলাভিষেকে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় তিন কোটি ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

কিংবদন্তী, নীলকণ্ঠ মহাদেবকে বিষের জ্বালা থেকে মুক্ত করার জন্য ত্রেতা যুগে কেবল রাবণ নন, পরশুরামও বাঁকে করে গঙ্গাজল এনে পুরামহাদেব মন্দিরে শিবলিঙ্গে জল ঢালেন।

রাবণ বা পরশুরামের পায়ে হেঁটে গঙ্গা জল এনে শিবের মাথায় ঢালার এই ঘটনার পর থেকেই শিব ভক্তরা শ্রাবণ মাসে হন জলযাত্রী। খালিপায়ে গঙ্গাজল বাঁকে করে গঙ্গা অথবা কোনো পুণ্যতোয়া থেকে জল এনে ঢালেন শিবলিঙ্গে। ভারত জুড়েই হয় শিবের এই জলাভিষেক যাত্রা। এইসব যাত্রার মধ্যে নানা কারণেই বিহারের সুলতানগঞ্জে বা অজগৈবীনাথ ধাম থেকে উত্তরবাহিনী গঙ্গাজল আনার 'কাঁওরযাত্রা' এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

যুবা থেকে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, এমনকী বালক-বালিকারাও গৈরিক বসনে সেজে সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গাজল নিয়ে বাঁকে করে বৈদ্যনাথধামে। তাঁদের 'বোল ব্যোম' ধ্বনিতে মুখর হয় আকাশ-বাতাস।

শ্রাবণেই কেন?

প্রশ্ন, শ্রাবণেই কেন জল ঢালা হয় শিবের মাথায়? পুরাণকথা, শ্রাবণ হলো শিবের অন্যতম প্রিয় মাস। এই মাসেই শিবের আবির্ভাব হয়, এমনটাই ভক্তদের বিশ্বাস। বিশ্বাস, এই মাসে শিবের মাথায় জল ঢাললে পূর্ণ হয় সকলের সব কামনা।

এই শ্রাবণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রয়েছে নানা কাহিনি ও জনশ্রুতি। বলা হয়, এই শ্রাবণেই হয়েছিল সমুদ্র মন্থন এবং এই মাসেই হলাহল পান করে শিব হন নীলকণ্ঠ।

আরেক কাহিনি, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয় গৃহে পার্বতী হয়ে জন্মান। এই শ্রাবণেই হয়েছিল শিব-পার্বতীর পুনর্মিলন। অর্থাৎ এ মাসেই হয়েছিল তাঁদের বিয়ে।

কেউ কেউ বলেন, এই শ্রাবণেই মহাদেব শ্বশুরবাড়িতে আসেন এবং তখন তাঁকে করা হয় নানাভাবে আপ্যায়ন। সে কথা স্মরণেই শ্রাবণে করা হয় শিবের জলাভিষেক।

অন্য কথায়, শিব কথা দিয়েছিলেন প্রজাপতি দক্ষকে, শ্রাবণ মাসে তিনি থাকবেন তাঁর বাড়িতে। তাই এ মাসের এতো গুরুত্ব। প্রচলিত ধারণা, শ্রাবণ মাসে শিব-পার্বতী এই মরলোকে ভ্রমণ করে ভক্তদের মঙ্গল করেন। সে কারণেই এই মাসে করা হয় শিবের বিশেষ পূজা।

অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে এই শ্রাবণই হলো পুণ্য চাতুর্মাস্য ব্রত পালনের সূচনা মাস। দশনামী পরম্পরার সন্ন্যাসী ও সাধকরা চাতুর্মাস্য পালন করে থাকেন। চাতুর্মাস্য ব্রত পালন অন্যান্যদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেই কারণেও বিশেষ করে গৃহী ভক্তরা এই মাসে শিবের আশীর্বাদ কামনায় তাঁর মাথায় জল ঢালেন।

শ্রাবণ মাসের বিভিন্ন দিনের মধ্যে সোমবার আবার বিশেষ মাহাত্ম্যযুক্ত। সোমবারই শিব-পার্বতী একসঙ্গে থাকেন বলে দিনটির গুরুত্ব ভক্তদের কাছে অনেক বেশি।

বৈদ্যনাথ ধাম

মধুবার সোমবার। বিশ্বাস, সোমবারেই আবির্ভূত হন শিব- মহেশ্বর। তাই এই পুণ্যবারে শিবের মাথায় জল ঢাললে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। আর সে কারণেই বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথধামে নামে পুণ্যার্থীদের ঢল। অবশ্য সারা ভারতেই শিবভক্তদের কাছে শ্রাবণ মাস অতি পুণ্যমাস। প্রায় সর্বত্রই শিব মন্দিরগুলিতে ওই সময় দেখা যায় ভক্তদের ভিড়। কিন্তু নানা কারণেই বৈদ্যনাথ ধামে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য পুণ্যার্থীরা যে অশেষ কৃচ্ছ্রতা পালন করেন তা এক বিস্ময়। প্রায় ১০৫ কিলোমিটার দূর থেকে পদব্রজে গঙ্গাজল এনে বৈদ্যনাথ ধামে শিবের মাথায় জল ঢালেন তাঁরা।

শাস্ত্রমতে পূজিত শিবলিঙ্গের মধ্যে জ্যোতির্লিঙ্গগুলির রয়েছে বিশেষ মাহাত্ম্য। পুরাণমতে সারা দেশে রয়েছে ৬৪টি জ্যোতির্লিঙ্গ। এর মধ্যে বিখ্যাত হলো ১২টি। সেই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথ ধামের বৈদ্যনাথ। জ্যোতির্লিঙ্গগুলির মধ্যে বঙ্গপ্রদেশের সবচেয়ে কাছের শৈবতীর্থ হলো বৈদ্যনাথ ধাম। স্বভাবতই এই তীর্থ সম্পর্কে বঙ্গবাসীদের রয়েছে বিশেষ আগ্রহ। তবে শ্রাবণ মাসে বৈদ্যনাথে জল ঢালার জন্য শতাধিক কিলোমিটারের যে পদযাত্রা বা 'কাঁওরযাত্রা' হয় তাতে বঙ্গবাসী প্রায় নগণ্য। তা সত্ত্বেও বঙ্গবাসীর কাছে বৈদ্যনাথ ধামের রয়েছে সবিশেষ মর্যাদা। রয়েছে এই মন্দির সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ।

বৈদ্যনাথ ধামে এই জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরটি কবে নির্মিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। কিংবদন্তী, এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। মন্দিরটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র।

পুরাণ কাহিনি, রাবণের তপস্যায় তুষ্ট হন মহেশ্বর। বর প্রার্থনা করতে বলেন তিনি রাবণকে। রাবণ অন্য কোনো বর নয়, কৈলাস থেকে একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে যেতে চান লঙ্কায়। আপাত নিরীহ এই প্রার্থনায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি মহাদেব। কিন্তু তাতে প্রমাদ গোনেন দেবতারা। শিবলিঙ্গ লঙ্কায় নিয়ে গেলে রাবণ হয়ে উঠবেন তুলনাহীন ক্ষমতায় অধিকারী। তাতে বিপন্ন হবে ধর্ম। তাই মহাদেবকে ওই বর প্রত্যাহার করার জন্য প্রার্থনা জানান দেবতারা।

মহাদেব বলেন, যে কথা তিনি দিয়েছেন তা প্রত্যাহার করার কোনো কথাই ওঠে না। তবে রাবণ যাতে শিবলিঙ্গটি নিয়ে যেতে না পারেন, তার একটা ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর চাই দেবতাদের সাহায্য।

দেবতারা এক কথায় রাজি। মহাদেব তখন বরুণদেবকে বলেন, তুমি রাবণের উদরে প্রবেশ করে তীব্র প্রস্রাব বেগ সৃষ্টি করো। অন্যদিকে রাবণকে বলেন, দেখো বাপু, শিবলিঙ্গ তুমি লঙ্কায় নিয়ে যেতে পারো অবশ্যই। তবে আমার একটি শর্ত আছে।

রাবণের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা, শর্ত! কী আপনার শর্ত! বলুন, আমি সব কিছুই মানতে প্রস্তুত।

মহাদেব বলেন, না, তেমন কঠিন কোনো শর্ত নয়। কৈলাস থেকে এই শিবলিঙ্গ নিয়ে তুমি সোজা যাবে লঙ্কায়। পথে কোথাও নামাবে না এটি। সাবধান, যদি কোথাও নামাও, তাহলে সেখানেই থেকে যাবে এই শিবলিঙ্গ। তখন হাজার চেষ্টা করলেও আর নড়াতে পারবে না এটিকে। তাই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু নির্ভর করছে তোমার উপর।

সেই শর্তে রাজি হন রাবণ। স্নান করে পবিত্রভাবে তিনি গ্রহণ করেন 'কামনা লিঙ্গ'। তারপর কৈলাস থেকে যাত্রা করেন লঙ্কার উদ্দেশ। তাঁর সেই যাত্রাপথে শ্রীবিষ্ণু তাঁর সামনে হাজির হন এক রাখালবালকের বেশে। বলেন নাম তাঁর বৈজু গদরিয়া। বৈজুর সঙ্গে কথা বলে খুবই খুশি হন রাবণ। এই সময় তাঁর প্রস্রাব পায়। বৈজুকে বিশ্বাস করে 'কামনা লিঙ্গ' মূর্তিটি ধরার জন্য অনুরোধ করেন। বলেন, ভুলেও মূর্তিটি মাটিতে রাখবে না। বৈজু বলে ভয় নেই, তুমি যাও তোমার কাজ সেরে এসো।

সরল বিশ্বাসে তার হাতে কামনা লিঙ্গ তুলে রাবণ শৌচ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম শেষে করেন সূর্যপ্রণাম। সব কিছু সেরে মনের আনন্দে ফেরেন রাবণ। ফিরে অবাক এবং আতঙ্কিত রাবণ। নেই সেই বালক, বৈজু। সে উধাও হয়েছে শিবলিঙ্গটি মাটিতে রেখে। ত্রস্তে রাবণ তুলতে যান সেই শিবলিঙ্গ। পারেন না। প্রথমে হালকা ভাবেই চেষ্টা করেছিলেন। শেষ সর্বশক্তি দিয়ে লিঙ্গটি তুলতে যান। কিন্তু সেই কামনা লিঙ্গ একবারে অচল। মনে হয় তার গোড়া পাতাল ভেদ করে চলে গেছে অনেক--- অনেক নীচে। বহু চেষ্টাতেও শিবলিঙ্গটি তুলতে না পেরে বুড়ো আঙুল দিয়ে তাঁর মাথায় জোরে চাপ দেন। তাতে আংশিক ক্ষতি হয় শিবলিঙ্গটির।

চলে যান রাবণ। তারপর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এখানে মন্দির তৈরি করে দেন। রাবণের আনা শিবলিঙ্গের ওপর মন্দির বলে বৈদ্যনাথ ধামটি রাবণেশ্বর ধাম নামেও পরিচিত। সাধারণত শিব মন্দিরের মাথায় থাকে একটি ত্রিশূল। কিন্তু বৈদ্যনাথ মন্দিরের মাথায় রয়েছে পাঁচটি ত্রিশূল।

জ্যোতির্লিঙ্গের কথা

বৈদ্যনাথ ধামের শিবলিঙ্গটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। শিব পুরাণের মতে, একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জড়িয়ে পড়েন এক দ্বন্দ্বে। দু'জনেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন। তা নিয়েই বাদানুবাদ। সেই সময় শিব এক আলোক স্তম্ভ রূপে আবির্ভূত হন সেখানে। সেই স্তম্ভের আদি অন্ত জানার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যথাক্রমে উপরে ও নীচের দিকে যাত্রা শুরু করেন। বহুদিন পরে আদি অন্তের হদিশ না পেয়ে ফিরে আসেন দু'জনেই। ব্রহ্মা কিন্তু মিথ্যে বলে দাবি করেন তিনি পৌঁছেছিলেন স্তম্ভের মাথায়। ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণে ক্রুদ্ধ শিব অভিশাপ দেন, জগতে ব্রহ্মা আর কখনো পূজা পাবেন না। আর বিষ্ণু হবেন জগদ্‌বন্দনীয়।

শিবের এই আলোক স্তম্ভটি জগতে জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

বৈদ্যনাথ ধাম শক্তিপীঠও

বৈদ্যনাথ কেবল মহা শিবতীর্থ নয়, বৈদ্যনাথ আবার শক্তিপীঠও। সুদর্শন চক্রে খণ্ডবিখণ্ডিত সতীর হৃদয় পড়েছিল এই বৈদ্যনাথে। সে কারণে এটি একান্ন সতীপীঠের অন্যতম। আর সে কারণেই একই সঙ্গে শিব ও শক্তির আরাধনার জন্য ভক্তরা ছুটে আসেন বৈদ্যনাথ ধামে।

সব কামনা পূর্তির আশায় সুদূর অজগৈবীনাথধাম থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাজল বয়ে এনে শিবের জলাভিষেক করেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত শ্রাবণের সোমবারগুলিতে।

পুনশ্চ :

ভক্তরা বছরের পর বছর বাঁকে জল নিয়ে যান শিবতীর্থগুলিতে। কিন্তু ২০২৫-এ ভক্তি ও বিশ্বাসের এক নতুন নজির গড়েছেন একুশ বছরের হরনাম প্রসাদ। এক অভূতপূর্ব 'কাঁওর যাত্রা' করেছেন তিনি। ১০৫ দিন ধরে হেঁটে জব্বলপুর থেকে অমরনাথে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢেলেছেন তিনি। অতিক্রম করেছেন ১৭০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ। বলেছেন, এক দৈবী ও ঐতিহাসিক পদযাত্রা--- তথা শিবের জলাভিষেকের এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

রাখিবন্ধন ও জাতীয় সংহতি

অতুল কুমার বিশ্বাস

সংস্কৃত শব্দ 'রক্ষাবন্ধন' থেকে রাখিবন্ধন শব্দের উৎপত্তি। কথিত আছে, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। দেবসেনাপতি দানবদের হাতে পরাজিত হচ্ছেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে তাঁর নামে রঙিন সুতো দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দিয়ে তাঁর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অনেকের ধারণা, এখান থেকেই রাখির উৎপত্তি। মহাভারতে দেখা যায় যে, মাতা কুন্তী তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে রাখি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিলেন, আর সেই পুত্র পরবর্তীকালে বীরত্ব ও রাজত্ব লাভ করল। এক্ষেত্রে মায়ের রক্ষাসূত্র পুত্রকে রক্ষা করল। সীতাদেবীর সন্তান জন্মাবার পর মহর্ষি বাল্মীকি শিশুর হাতে মন্ত্রপূত কুশ পরিয়ে দিয়ে তাঁদের রক্ষাবন্ধন করালেন এবং নামকরণ করলেন যথাক্রমে কুশ ও লব। মাতা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় রক্ষাবন্ধন করেছিলেন। আজও মায়েরা বিপত্তারিণী ব্রত করে ছেলে-মেয়েদের হাতে আশীর্বাদপূত তাগা বেঁধে দেন সন্তানদের মঙ্গল কামনায়, এটিও রাখির নামান্তর মাত্র। শ্রাবণী পূর্ণিমায়া রাখিবন্ধনের কথা বেদ সংহিতায় উল্লেখ আছে। দক্ষ বংশোৎপন্ন একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজা শতানীকের মণিবন্ধে স্বর্ণিম রক্ষাসূত্র বন্ধন করে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। সমাজ সুরক্ষার জন্যে ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে এই রক্ষাবন্ধন সূত্রেই আবদ্ধ করেছিলেন। আজও কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতরা তাঁদের যজমানদের হাতে কুশের তৈরি বলয় পরিয়ে দিয়ে মঙ্গলকামনা করেন।

শুধুই পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও রক্ষাবন্ধন সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পুরুর সঙ্গে আলেকজান্ডারের যুদ্ধের সময় গ্রিক রাজমহিষী পুরুর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন স্বামীর সুরক্ষা কামনা করে। মোগল যুগে চিতোরের রানি কর্ণাবতী গুজরাটের নবাব বাহাদুর শাহের দ্বারা আক্রান্ত হলে সাহায্য প্রার্থনা করে বাদশা হুমায়ুনের কাছে রাখি পাঠিয়েছিলেন। বাদশা সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাবতীকে বোন বলে স্বীকার করেন এবং বোনকে রক্ষার জন্য সুদূর বঙ্গদেশ থেকে চিতোর যাত্রা করেন। কিন্তু বাদশা চিতোরে পৌঁছবার আগেই সম্মান রক্ষার জন্য আক্রান্ত রানি জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমায় ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে এবং ভাইয়েরাও বোনদের রক্ষার শপথ গ্রহণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে রাখিবন্ধন করেছিলেন জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তি বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি প্রয়োগ করে বঙ্গকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে দুই ভাগে ভাগ করার চক্রান্ত করেছিল। সারা বঙ্গ জুড়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনে রবীন্দ্রনাথ রাখি হাতে পথে নেমেছিলেন বাঙ্গালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে। সেদিন সকলের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা গান—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান।।

সেদিন বঙ্গে এমন কোনো নগর, গ্রাম, জনপদ ছিল না সেখানে রাখিবন্ধন উৎসবের কোলাহল উঠেনি। এমন তরুণ ছিল না যে সেদিন দেশের কাজে উদাসীন ছিল। সমস্ত বাঙ্গালিজাতি পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে বঙ্গকে অখণ্ড রাখার শপথ গ্রহণ করেছিল। রাখি যে একতাবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে তা সেদিন ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালি জাতির কাছে পরাজয় স্বীকার করে ১৯১১ সালে কার্জন বঙ্গভঙ্গ রদ করেন— দুই বঙ্গ আবার এক হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাখিবন্ধন উৎসবটিকে একটি জাতীয় রূপ দিয়েছে। ভারতবাসীর মধ্যে একই সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত হলেও ভাষা-সম্প্রদায়-পন্থ ও কর্মগত শ্রেণীবিভাগের কারণে সমাজের মধ্যে একাত্মতার অভাব অনুভূত হচ্ছে। ফলে সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ ভাব, ঘৃণা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাখিবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ভেদভাব দূর করে সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে দেশের ছোটো-বড়ো বহু সংগঠনই রাখি উৎসবকে সামনে রেখে দেশবাসীর মধ্যে ভেদাভেদ ও অনৈক্যকে দূর করে দেশকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রাখিবন্ধন উৎসব চিরাচরিত শাস্ত্রীয় বোন-ভাইয়ের মধ্যে সীমিত না থেকে সমাজের সর্বস্তরে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময়, জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। রাখিবন্ধনের পুণ্য তিথিতে সমগ্র ভারতবাসী ভারতের জাতীয় ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় এক সংকল্পসূত্রে গ্রথিত হোক— এই প্রার্থনা। □

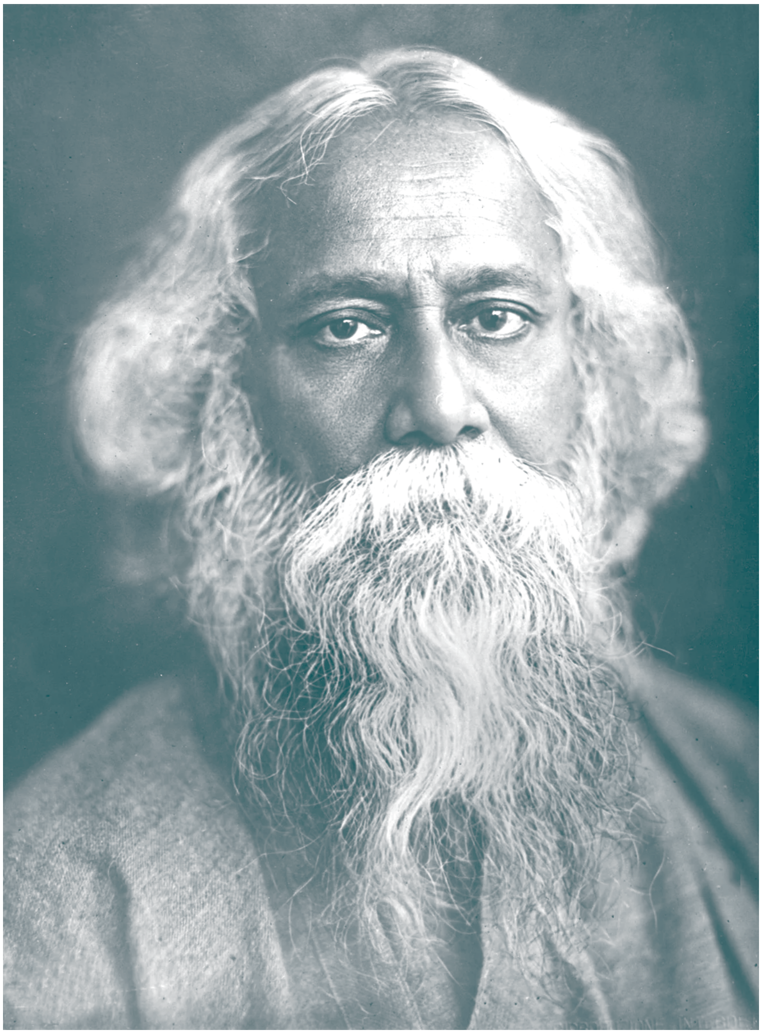

আপন প্রতিভা বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি

দীপক খাঁ

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ, মা সারদার চতুর্দশ সন্তান হিসেবে পৃথিবীর আলো দেখেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত।

ছেলেবেলায় তেরো বছর আট মাস বয়সে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম স্বনামে কবিতা ছাপা হয়— 'হিন্দুমেলার উপহার'। দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করত। তাঁদের আড্ডায় যোগ দেন অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র সেন। এঁদের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথ যোগ দিতেন।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রকাশিত হলো— সেখানে নিয়মিত লিখে চলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব কবিতার ভাবনির্যাস শিশু বয়স থেকেই 'ভানুসিংহের পদাবলী'— ব্রজবুলি ভাষায় এই কবিতাগুলি লেখা। এবার কবি লিখলেন, 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামের গীতিনাট্য। রবীন্দ্রাথের ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বৌঠান কাদম্বরী দেবী তখন থাকতেন চন্দননগরে— বাড়ির পাশেই গঙ্গা, কবি লিখছেন— সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের প্রাণের বাণী বহন করে। এখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন— 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের জীবন অবলম্বন করে এই কাহিনি গড়ে উঠেছে। পরে সদরস্ট্রিটের বাড়িতে— 'তখন সূর্যোদয় হইতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম, হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।' এই অপূর্ব অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি লিখলেন বিখ্যাত কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ঠাকুর বাড়িরই এক কর্মচারীর কন্যা— বয়স বারো, নাম— ভবতারিণী। তাঁর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। বিয়ের পর নতুন কন্যার নাম হলো মৃণালিনী দেবী। পাঁচ মাস পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন। তিনি যে শুধু রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করতেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রেরণা। সমস্ত জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসংখ্য রচনায় বউদির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি চাকুরি করতেন। অন্য ছেলেরা জমিদারি দেখাশোনার কাজে উপযুক্ত ছিলেন না। তাই সব ভার এসে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। বঙ্গের গ্রামেগঞ্জে নদীপথে ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা তাঁর সাহিত্যকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ফঃ ৫

তাঁর জীবন প্রকৃত অর্থেই ছিল প্রবহমান নদীর মতো।

বন্ধু শ্রীশচন্দ্র 'হিতবাদী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। সেই সময় তিনি জমিদারির কাজে নিয়মিত শিলাইদহে যেতেন— সেখানকার মানুষজনের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখের আলোয় জন্ম নিতে থাকে একের পর এক ছোটো গল্প। যেমন, দেনাপাওনা, গিন্নি, পোস্টমাস্টার, ব্যবধান, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। প্রতিটি গল্পই প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী' পত্রিকায়।

পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা মিলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করল, নাম 'সাধনা'। তাতে রবীন্দ্রনাথের কলমে গল্পের জোয়ার বইতে শুরু করল। প্রথম গল্প— খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি সমর্পণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, জয়পরাজয়, দালিয়া— প্রতিটি গল্পই বিয়োগান্তক। জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফাল্গুন মাস, কোথাও বৃষ্টির আভাস নেই, হঠাৎ কবির মধ্যে জেগে উঠল বার্ষধারার আবেগ। লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা— 'সোনার তরী', গানে গরজে মেঘ ঘন বরষা কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা'।

এই কবিতা নিয়ে সমসাময়িককালে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। আসলে এক শ্রেণীর মানুষ তাঁর খ্যাতি প্রতিভায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কবির সৃজনী শক্তির পথে তারা কোনরকম প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতে পারেনি।

প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। নিজের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন— 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার', 'রাজা ও প্রজা'। প্রতিটি রচনায় ফুটে উঠেছে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ।

১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাতে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা হয় সেই ব্যাপারে তাঁর ছিল সুতীব্র আগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের শিক্ষিত মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এই সময় দক্ষিণারঞ্জন রচনা করলেন 'ঠাকুমার ঝুলি'। পরের বছর প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' আর চৈতালি'। চিত্রায় কবি স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে নেমে এসেছেন। এতে সংকলিত কবিতাগুলি হলো— এবার ফিরাও মোরে, পূর্ণিমা, স্বর্গ হইতে বিদায়, ঊর্বশী, ব্রাহ্মণ। এছাড়াও দুটি জনপ্রিয় কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'-তে অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ফুটে উঠেছে।

দেশের অতীত ইতিহাস, তার গৌরবগাথা, মানুষের ত্যাগের মহিমা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারই প্রকাশ ঘটেছে 'কথা ও কাহিনি'র কবিতাগুলির মধ্যে। সাহিত্য জগতের মানুষ হয়েও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। জগদীশচন্দ্র বসু তখন বিলেতে গবেষণা করছেন, তাঁর অর্থের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের শরণাপন্ন হলেন। মহারাজা রবীন্দ্রনাথকে দশ হাজার টাকা দিলেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে নতুন করে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদক। প্রবন্ধ কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত হলো নতুন উপন্যাস— 'চোখের বালি'।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন সপরিবারে থাকার পর শান্তিনিকেতনে এলেন। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন, আবাসিক বিদ্যালয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আশ্রমের আদর্শে এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁর মৃত্যু হলো। মৃণালিনী দেবীর বয়স তখন ত্রিশ আর রবীন্দ্রনাথের একচল্লিশ বছর। তাঁদের তিন কন্যা— মাধুরীলতা, রেনুকা, মীরা। দুই পুত্র— রবীন্দ্রনাথ ও সমীন্দ্রনাথ। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই কন্যা রেণুকা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কবির আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। তখন রেণুকার বয়স মাত্র তেরো বছর। তাঁর অল্পদিন আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পর পর দুটি বিয়োগ ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু থেমে যাননি।

সেইসময় বড়লাট কার্জন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে সচেষ্ট হলেন। বহু মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে সে প্রচেষ্টা সফল না হলেও বেশ কিছু সমস্যা রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের মূল সমস্যা দারিদ্র, প্রয়োজন গ্রমীণ ক্ষেত্র উন্নয়ন, পল্লীসংগঠন। তাঁর সেই অভিমত সে সময় কোনো গুরুত্ব না পেলেও উত্তরকালে সকলেই তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সে যুগে ধনী পরিবারের সকলেই পুত্রদের বিলেতে পাঠাতেন হয় আইসিএস কিংবা ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠালেন কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য, যাতে তারা গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল শ্রীনিকেতনে।

কবির ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহে। তার পাশাপাশি চলতে থাকে গীতাঞ্জলি লেখার কাজ। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে কবি লিখতে আরম্ভ করলেন বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাস। প্রায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে 'গোরা' প্রকাশিত হলো 'প্রবাসী' পত্রিকায়। হিন্দু সমাজ,

জীবন, তার ধর্মীয় সংকীর্ণতা, জাতিভেদের ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথ এক সত্যের ইঙ্গিত করেছেন এই উপন্যাসে। শান্তিনিকেতনে বসে কবি লিখলেন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'ডাকঘর'।

পুত্রবধূ প্রতিমাকে নিয়ে এবার বিলেতে গেলেন। প্রতিমা গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবীর কন্যা। অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। সেই বালবিধবার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা হয় না। বিলেতে কবির সঙ্গে পরিচয় ঘটে কবি ইয়েট্স-এর। ইয়েট্স রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হলো গীতাঞ্জলি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বের হলো।

১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বরে কবির কাছে সংবাদ এল তাঁকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তিনিই প্রথম প্রাচ্যবাসী যিনি এই পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।

অর্থ, যশ, খ্যতি কবির জীবনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রয়াগরাজে এক আত্মীয়দের বাড়িতে চোখে পড়ে বউদি কাদম্বরী দেবীর একটি ছবি। লিখলেন নতুন কবিতা 'ছবি'। তারপর একের পর এক সৃষ্টি হতে থাকে 'বলাকা'-র অবিস্মরণীয় সব কবিতা। সবুজের অভিযান, শঙ্খ, শাজাহান, ঝড়ের খেয়া, বলাকা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই নারীকে অন্তঃপুরের বাসিন্দা হিসেবে দেখতে চাননি। নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশ্বাস রাখতেন। তারই প্রকাশ ঘটল 'সবুজপত্রে' একের পর এক প্রকাশিত ছোটো গল্প। এই গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র। 'স্ত্রীর পত্র' সেই সময় শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট ঝড় তুলেছিল। ১৯১১ সালের ১৩ এপ্রিল ইংরেজ সৈন্যরা জালিয়ানওয়ালাবাগে ৩৭৯ জনকে নৃশংস হত্যা করে। এই ঘটনার তীব্র ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথ চেমস্‌ফোর্ডকে লেখা এক খোলা চিঠিতে সরকার প্রদত্ত 'নাইট হুড' উপাধি ত্যাগ করবার কথা ঘোষণা করেন। ইংরেজ শাসক এতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলো। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানাল। দেশাত্মবোধ এতটাই প্রবল ছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেব যখন ছাত্রদের হাতে মার খেলেন, অনেকে ছাত্রদের নিন্দা করলেও তিনি তা করেননি। ছাত্র শাসন প্রবন্ধে লেখেন— 'ছাত্ররা যদি প্রতিনিয়ত বিদেশি অধ্যাপকের কাছে তাদের দেশের, জাতির, ধর্মের অপমানকর কথা শোনে, ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করবেই। যদি সেটা না করে সেটাই হবে লজ্জা আর দুঃখের বিষয়।'

অন্যদিকে চৌরিচৌরার ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রোধকে উত্তেজিত করে তারপর অহিংসার মন্ত্র দ্বারা সে রিপুকে বশ মানানো যায় না। ক্রোধ তার ইন্ধন খোঁজে।' দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন— 'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু-মুসলমান কেবল মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে... এক্ষেত্রে শুধু চরকার সুতো কাটলে সমস্যার সমাধান হবে না, বিদেশিকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলতে... এমনকী স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখ দহনের নিবৃত্তি হবে না।' রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল পরেও সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাধ্যমে। তখন কবি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রচনায় ফুটে ওঠে পরিবর্তনের ছোঁওয়া। এই সময় লিখলেন 'রক্তকরবী', 'চণ্ডালিকা'। রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা কবির ভালো লেগেছিল— নতুন দেশ গড়ার উদ্যম কবিকে মুগ্ধ করেছিল। লিখলেন— 'রাশিয়ার চিঠি'।

শান্তিনিকেতনের জন্য কবির ভাষায়— 'ভিক্ষাপাত্র' নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। তাছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক আসে। কাউকেই ফেরাতে পারেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দেবার জন্য কবিকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনিই প্রথম বেসরকারি ব্যক্তি যিনি এই সম্মান পেলেন। বহুদিনের চিরচারিত প্রথা ভেঙে কবি বাংলায় বক্তৃতা দিলেন।

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় মর্মাহত হলেন। তিনি লিখলেন— কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত তাপ হয়তো তাঁর অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠছে।

শুধুমাত্র স্বদেশের মধ্যকার মানুষদের বিবাদ-বিসংবাদ নয়, ইউরোপের বুকে জার্মানির আগ্রাসন, চীনের উপর জাপানের অত্যাচার কবিকে মর্মাহত করত। তিনি জাপানি কবি ইয়াস নোগুচিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— আমি জাপানিদের ভালোবাসি, কিন্তু তাদের জয় কামনা করতে পারি না। অনুশোচনার ভিতর দিয়ে তাদের প্রায়শ্চিত্ত হোক। ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনে কবিকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হলো। দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা কবিকে সম্মান জানাল। জনৈক প্রবীণ সমালোচক লিখেছেন— সাধারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক তাঁর উলটো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন।

(কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বাঙ্গালি ভাবাবেগ উসকে দিয়ে আদতে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে চাইছেন মমতা

প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

মাস সাতেক পরেই পড়বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ঢাকে কাঠি। এই নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। এজন্য তিনি বেছে নিলেন ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চকে। সেখানেই জানিয়ে দিলেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নয়া হাতিয়ার কী হতে চলেছে।

পরপর তিনটি টার্মে মুসলমানদের দাবার বোড়ে করে বিরোধীদের মাত দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বারবার ব্যবহারে সেই অস্ত্র এখন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তাই এবার নয়া হাতিয়ার তৈরি করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই ছিল শেষ ২১ জুলাই। এদিন ধর্মতলার জনসভায় (পোশাকি নাম শহিদ দিবস। তবে এটা বললে যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের অপমান করা হয়। কারণ যেদিনের ঘটনা নিয়ে এদিন সভা করা হলো, সেটি ছিল আদতে একটি নিখাদ রাজনৈতিক কর্মসূচি। তাও আবার তৃণমূলের নয়, যুব কংগ্রেসের। কংগ্রেসের দাবি, তাদের কর্মসূচিকে হাইজ্যাক করা হয়েছে) আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সুর বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তুরুপের তাস যে হতে যাচ্ছে বাঙ্গালি ভাবাবেগ, এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো স্বয়ং। একটি সার্কুলার তুলে ধরে তিনি জানান, এটি বাঙ্গালি বিরোধী সার্কুলার। এই সার্কুলারে বলা আছে স্রেফ সন্দেহের বশে মানুষকে এক মাসের জন্য আটকে রাখা যাবে। তিনি বলেন, 'এক হাজারের ওপর মানুষকে মধ্যপ্রদেশ, কাউকে ওড়িশা, তো কাউকে রাজস্থানের জেলে ভরা হয়েছে।' তাঁর দাবি, কেন্দ্র ঘুরপথে এনআরসি করার চেষ্টা করছে। বাঙ্গালিদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চলছে। তৃণমূল নেত্রীর শ্লেষ, 'বাংলা ভাষায় নাকি কথা বলা যাবে না।' তার পরেই তাঁর হুংকার, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যদি বাংলা বলার জন্য বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে এই লড়াই কিন্তু দিল্লিতে হবে।' তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে ভাষা আন্দোলন হবে। দেখে নেব, কত জেল আছে, কত ডিটেনশন ক্যাম্প আছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে প্রত্যাশিত ভাবেই উঠে এসেছে বিহারের ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'বিহারের ভোটার তালিকায় যেভাবে নাম বাদ পড়েছে, সেভাবে এই রাজ্যে বাদ দিতে এলেই আন্দোলন হবে।' নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

এতো গেল তৃণমূল নেত্রীর হুমকি-বার্তার কথা। মেঠো রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি বরাবর যে ভাষায় কথা বলেন, এদিনও তাই করেছেন, নতুন কিছু নয়। এবার ফিরে আসা যাক মুদ্রার উলটো পিঠে। সেখানে কী দেখছি আমরা? আমরা দেখছি, শুধু বিহারেই ব্যাপক গলদ ধরা পড়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযানে। ইতিমধ্যেই ৯৫ শতাংশ ভোটারের সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ১১ হাজার ভোটারকে চিহ্নিতই করা যাচ্ছে না। তাদের দেওয়া ঠিকানায় কোনো বাড়ি নেই, তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন না প্রতিবেশীরাও। ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানান, এই ১১ হাজার ভোটার সম্ভবত বাংলাদেশি মুসলমান এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী, যারা বিহারে ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করেছে। যদিও বিহার নয়, তারা বসবাস করছে আশপাশের রাজ্যগুলিতে।

> একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পদে বসে কীভাবে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে সওয়াল করেন, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না শিক্ষিত বাঙ্গালিরাও। এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন এ রাজ্যের বিদ্বজ্জনেরা।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই অনিয়মগুলির পেছনে দায়ী আগের পর্যালোচনার সময় অবহেলা বা দুর্নীতি, যার ফলে অননুমোদিত ব্যক্তিরাও ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া ঠিকানায় কোনো ঘরই নেই, এমনকী প্রতিবেশীরাও তাদের চেনেন না। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো বিহারের ভোটার তালিকা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত করা এবং নিশ্চিত করা যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। তাদের দাবি, রাজ্যের ৪১.৬৪ লক্ষ ভোটারকে তাদের দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, এসবের মধ্যে ১৪.২৯ লক্ষ ভোটারকে সম্ভবত মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯.৭৪ লক্ষ ভোটার স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন এবং ৭.৫০ লক্ষ ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় রয়েছে। প্রায় ১১ হাজার ভোটারকে

‘আনট্রেসেবল’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযানে গিয়ে বুথ লেভেল অফিসাররা নেপাল, বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা বেশ কিছু বিদেশিকেও আটক করেছেন। এদের কাছে মিলেছে ভারতীয় নথিপত্র যেমন আধার কার্ড, রেশন কার্ড ও বসবাসের জন্য শংসাপত্র। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরেই শুরু হয়েছে তদন্ত। বিদেশিরা কীভাবে এসব সরকারি নথি জোগাড় করল, জালিয়াতির শেকড়ই-বা কতদূর বিস্তৃত, তা জানতেই শুরু হয়েছে তদন্ত।

বিহারের এই ছবি থেকে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট, কেন মুখ্যমন্ত্রী ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে অস্ত্র করলেন বাঙ্গালির ভাবাবেগকে? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে প্রশ্নের মধ্যেই। ছাব্বিশের নির্বাচনে এই ‘বিদেশি’রাই ভারতীয় ভোটার সেজে ভোট দেবে তৃণমূলকে। এই অনুপ্রবেশকারীদের সিংহভাগই বাংলাদেশি মুসলমান। মায়ানমার থেকেও যারা এদেশে ঢুকে পড়েছে অবৈধভাবে, তারাও মুসলমান (স্থানীয় ভাষায় রোহিঙ্গা)। কলকাতা তো বটেই, বিধাননগরেরও বেশ কিছু অঞ্চলের বস্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের ভিড়ে মিশে রয়েছে এরা। এদেরই ভোট পেয়ে লোকসভা নির্বাচনে ভাইপো জেতেন ৭ লক্ষ ভোটে (অবশ্য ছাপ্পাও ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ)! যে কায়দায় সিপিএমের একাধিক নেতা জিততেন লক্ষ লক্ষ ভোটে, সেই কায়দায়ই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছেন ভাইপো! এই বিদেশিদেরই হারাতে চাইছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকার। কারণ তারা ভাগ বসাচ্ছে ভারতবাসীর ভাতে। সস্তার শ্রমিকের পর্যাপ্ত জোগান হওয়ায় ভারতীয় শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না কাজও। অথচ পশ্চিমবঙ্গে কাজ না পেয়েই তাঁরা হয়ে গিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিক কিংবা ভিন রাজ্যের চাকুরে।

সবাই জানে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের লক্ষ্য বিদেশি বিতাড়ন। তাই শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযান। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তৃণমূল নেত্রী, ক্ষমতার চিটেগুড়ে যাঁর পা আটকে গিয়েছে। নবান্নের ১৪ তলাকে তিনি পারিবারিক সম্পত্তি বানাতে চান! প্রথমে তিনি, তারপর তাঁর ভাইপো, তারপর এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেরই কেউ বসবেন নবান্নের ওই ১৪ তলার ঠাণ্ডা ঘরটায়। সেই কারণেই কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে উৎখাত করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং! একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পদে বসে কীভাবে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে সওয়াল করেন, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না শিক্ষিত বাঙ্গালিরাও। এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন এ রাজ্যের বিদ্বজ্জনেরা। বুদ্ধদেবের জমানায়ও এঁরাই ছিলেন বুদ্ধিজীবী (পড়ুন, বুদ্ধজীবী।) এখনো এঁরাই এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়! তবে এখন এঁরা ভজনা করেন মমতার। তাই রাজ রোষানলে পড়ে সব খোয়ানোর ভয়ে মুখে লাগাম এঁটেছেন এঁরা।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন এ রাজ্যের বহু বাঙ্গালি। চাকরি সূত্রেও অনেকেই হয়েছেন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। কই, বিজেপি শাসিত রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁরা তো বাঙ্গালি খেদাও অভিযানের কোনো অভিযোগ করেননি? উত্তরপ্রদেশের কথাই ধরা যাক। সেখানকার নয়ডা-সহ অন্যত্র পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন বহু বাঙ্গালি। চাকরিও করেন অনেকে। তাঁদের ভিড়েই মিশে রয়েছে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গারা। তারাই ভাগ বসিয়েছে ভারতীয় বাঙ্গালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাতে। তাই পেটে টান পড়েছে এদেরই। কাজ না পাওয়ায় কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরাও। এ রাজ্যের বহু বাঙ্গালি ছেলে-মেয়ে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে বেঙ্গালুরুতে। কই, তাঁরাও বাঙ্গালি খেদাও বলে তৃণমূল নেত্রী যে অভিযোগ করছেন, তেমন কোনো অভিযোগ করেননি।

তাহলে কেন জনসমাবেশে মিথ্যে প্রচার করে বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী খেপিয়ে তুলছেন বাঙ্গালিদের? এর এক ও একমাত্র কারণ, তিনি চান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে। সেই কারণেই বাঙ্গালি ভাবাবেগ উসকে দিয়ে তিনি আদতে আড়াল করতে চাইছেন বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের মতো দুধেল গাইদের। যারা কোনো তৃণমূল নেতা বা নেত্রীর হাত ধরে জাল নথিপত্র বানিয়ে ‘বাঙ্গালি’ হয়ে গিয়েছেন সেই কবেই! এঁদের কাঁধেই ভর করে পর পর দু’বার ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রথমবার তিনি জিতেছিলেন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট বা প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটে।

তৃণমূল নেত্রী অবশ্য এরই মধ্যে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যদি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কলকেটা পাওয়া যায়, তাহলে নবান্নে ভাইপোকে বসিয়ে পিসি রওনা দেবেন দিল্লির উদ্দেশে।

তবে দিল্লি যে বহু দূর এবং একটি আঞ্চলিক দলের নেত্রী হয়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা যে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর শামিল, তা বোধহয় নিজেও জানেন। আর জানেন বলেই তিনি চাইছেন, পাকাপাকিভাবে নবান্নের গদি দখল করে রাখতে। নবান্নে যে ‘মধু’র স্বাদ তিনি পেয়েছেন, ক্ষমতায় না এলে তা কী সম্ভব হতো! গত ১৫ বছরে কালীঘাট অঞ্চলে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সম্পত্তির যে বহর হয়েছে, টালির চালের ঘরে থাকা কোনো মানুষের পক্ষেই বোধহয় তা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এত অল্প সময়ে। তা যদি হতো, তাহলে এ দেশের কাউকে প্রধানমন্ত্রী যোজনায় ঘর দিতে হতো না।

মুখ্যমন্ত্রীকেও ভোট ‘কিনতে’ নানা ‘শ্রী’ নামের আড়ালে ‘ভিক্ষে’ (পড়ুন, ঘুষ) দিতে হতো না বাঙ্গালিদের! এই খয়রাতির ও তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির হাঁড়ির হাল করে দিয়েছেন মমতা। তাই দিল্লির বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন টাকা না দেওয়ার।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে যে টাকা দিয়েছে, তা অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় অনুদানের পরিমাণ। ভোটের হাওয়া গরম করতে সেটাকেই হাতিয়ার করছে তৃণমূল। এর সঙ্গে উসকে দিলেন বাঙ্গালি ভাবাবেগকে। □

নবাঙ্কুর

শেয়াল ও সিংহ

বউ আর দুটো বাচ্চা নিয়ে এক সিংহ বাস করত এক গভীর জঙ্গলে। সকাল হলেই সিংহ বেরিয়ে পড়ত শিকারের সন্ধানে। যা কিছু পেত সব নিয়ে এসে বউয়ের হাতে তুলে দিত।

একদিন সিংহ বেরিয়েছে শিকারে। সারাদিন ইতিউতি খুঁজেও একটা শিকার করতে পারল না। হতাশ হয়ে নিজের গুহার দিকে রওনা দিল। পথে শুনতে পেল একটা কুঁইকুঁই শব্দ। সিংহ একটু দূরে দেখল গাছতলায় একটা শেয়ালের ছানা পড়ে কাতরাচ্ছে।

বাচ্চাটার প্রতি সিংহের কেমন মায়া হলো। সেটাকে না মেরে আলগোছে মুখে করে নিয়ে এল গুহায়। বউয়ের হাতে তুলে নিয়ে বলল— ধরো গো, আজ এটা ছাড়া কিছু পেলাম না। মারতে পারলাম না তাই জ্যান্তই নিয়ে এসেছি। দেখো তুমি কী করবে।

সিংহী বলল, তুমি ওকে মারতে পারলে না আর আমি সেই কাজটি করবো? আমাকে দিয়ে ওকাজ হবে না। ও বেঁচে থাক। আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে বড়ো হবে। সিংহী তার ছেলে দুটোকে ডাক দিল— দেখো, কে এসেছে। এ হলো তোমাদের ভাই। ওকে দাদা বলে ডাকবে। ওর সঙ্গে তোমরা খেলাধুলা করবে।

সিংহ ছানাদের বয়স কম। তারা দাদা পেয়ে বর্তে গেছে। শেয়ালছানার সঙ্গে হুটোপুটিতে মেতে উঠল।

সুখে-দুঃখে সিংহ পরিবারের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছে। তিনটে ছানা ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে একসঙ্গে।

তখন একটু বেশ বড়ো হয়েছে। একদিন ছানা তিনটির কী খেয়াল হলো তারা বাইরে বেড়াতে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়েও পড়ল। পথে চলতে চলতে তারা একটি হাতির সামনে এসে পড়ল। হাতি দেখে সিংহ ছানাদের সে কী হম্বিতম্বি। এমনভাবে হাতির দিকে তেড়ে গেল যেন এক্ষুনি মেরে ফেলবে।

কিন্তু শেয়াল ছানার প্রাণ তখন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। সে ভাইদের বলল— সর্বনাশ, তোরা কী করছিস? ওই বিশাল জন্তুটাকে আক্রমণ করেছিস, নিজেদের প্রাণটা যে যাবে। চল বাড়িতে পালিয়ে যাই। এই কথা বলে শেয়ালছানা সবার আগে লেজ তুলে লাগাল ছুট। দাদা পালিয়ে গেল, ভাইয়েরা আর কী করে, তারাও নিরাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরল।

তারা হাসতে হাসতে বাবা-মা'র কাছে দাদার পালিয়ে আসার গল্প শোনাল। তাই শুনে শেয়াল ছানা রেগে আগুন। ভাইদের মারবে বলে তেড়ে এল। সিংহী এগিয়ে এসে তাকে নিরস্ত করল। বুঝিয়ে বলল— বাছা, তুমি দাদা, ওরা তোমার ছোটো। কী বলতে কী বলে ফেলেছে, তাই নিয়ে গোল বাধাচ্ছ?

শেয়াল ছানার রাগ আরও বেড়ে গেল। গায়ের লোম ফুলিয়ে ফুঁসে উঠে বলল— ওরা আমাকে নিয়ে মজা করবে আর আমি চুপ করে থাকব? ওদের থেকে আমি কীসে কম? আমার গায়ে কি জোর নেই? নাকি আমি ভীরু?

সিংহী হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলল— না বাছা, তুমি ওদের থেকে কোনো অংশেই কম নও। তবে বাছা, তুমি যে বংশে জন্মেছ সেখানে কেউ কখনো হাতি ঘোড়া মারেনি।

শেয়াল ছানা মৃদুস্বরে জানতে চাইল— তার মানে? তুমি আমার মা নও? আমি তোমাদের কেউ নই? সিংহী শেয়াল ছানাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বলল— বাছা, তুমি এখন বড়ো হয়েছ, সত্যি কথাটা তোমাকে জানানো দরকার। তুমি সিংহ নও, শেয়ালের বংশে জন্মেছ। আমার ছেলেরা এসব জানে না। যেদিন জানবে সেদিন তোমাকে দাদা বলে খাতির করবে না। তোমাকে মেরে ফেলবে। তাই বাছা তোমাকে বলছি, এখনই এখান থেকে চলে যাও।

শেয়াল ছানা সবকথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। খানিক বাদে সংবিৎ ফিরে পেল। ছুটে চলে গেল বনের দিকে। আর পেছন ফিরে তাকাল না।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

মোল্লেম

মোল্লেম জাতীয় উদ্যান গোয়া রাজ্যে অবস্থিত। এটি রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ভগবান মহাবীর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অংশ এবং রাজ্যের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান। এই উদ্যান ২৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। রাজধানী পানাজি থেকে ৫৭ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই উদ্যান এবং আশেপাশের এলাকায় ৭৭২ প্রজাতির ফুলগাছ এবং ১২৮ প্রজাতির স্থানীয় গাছপালা রয়েছে। অন্যান্য জাতীয় উদ্যানের মতোই এখানেও রয়েছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ এবং বহু রকমের প্রজাপতি। এর ধারে-কাছেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির এবং দুধসাগর ও তাম্বতি নামে দুটি জলপ্রপাত রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৭

সংখ্যাপাঠঃ

১০০–১০০ শতম্ / একশতম্।

২০০–২০০ দ্বিশতম্ / দ্বেশতে।

৩০০–৩০০ ত্রিশতম্।

৪০০– ৪০০ চতু:শতম্।

৫০০–৫০০ পঞ্চশতম্।

৬০০–৬০০ ষট্‌শতম্।

৭০০–৭০০ সপ্তশতম্।

৮০০–৮০০ অষ্টশতম্।

৯০০–৯০০ নবশতম্।

ভালো কথা

ভিজে কাক

সারাদিন খুব বৃষ্টি। ঝমঝম বৃষ্টি। রাস্তাতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছিল। বিকেলে বৃষ্টি একটু কমতেই বাবা আমি বাইরের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলাম। দেখি, রাস্তায় একহাঁটু জলের মধ্যে একটা কাক পড়ে আছে। একেবারে আধমরা অবস্থা। বাবা কাকটাকে জল থেকে তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা কর। আমি বাড়ি নিয়ে এসে শুকনো কাপড় দিয়ে কাকটার গায়ের জল মুছে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে মরার মতো নেতিয়ে পড়ছে। মা কাকটির মুখটা ধরে হাঁ করে একটু দুধ দিলেন। তারপর একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখলাম। পরদিন বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখি কাকটি ভালো হয়ে বসে আছে। মা আবার মুখে একটু দুধ দিলেন। তারপর বাবা দুহাতে করে বাইরে নিয়ে এসে একটা গাছের ডালে বসিয়ে দিলেন। কাকটি আমাদের দিকে একটু দেখল, তারপর উড়ে চলে গেল।

অসীম পাল, সপ্তম শ্রেণী,গড়দরজা,বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) স গ বি ভো

(২) ধা শ্রা ণ রা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) নি হি রা কা ণ পু

(২) রি লি ধূ ধূ ত স

২১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) অসুখবিসুখ (২) সুযোগসুবিধা

২১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) ধারাবিবরণী (২) হরেকরকম

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) প্রীতিজা মাঝি, হৈবতপুর, মারিশদা, পূঃ মেদিনীপুর (৩) প্রীতি কুমার, বাঘমুন্ডি, পুরুলিয়া। (৪) মৈত্রী সরদার, ক্যানিং দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

‘বাঙ্গালি-প্রেম’ মমতা ব্যানার্জির দেউলিয়া রাজনীতির নয়া ন্যারেটিভ

সুজিত রায়

‘বাঙ্গালির জাত গেল, মান গেল। ভিন রাজ্যে বাঙ্গালির অস্তিত্ব বিপন্ন’--- বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসক দলের একমাত্র নেতা তথা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রব তুলেছেন। বাঙ্গালি মাত্রেই জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই রব আসলে কমিউনিস্টসুলভ একটা রাজনৈতিক ন্যারেটিভ মাত্র। কারণ গত ১৪ বছর ধরে তিনি সরকার চালাননি, সার্কাস চালিয়েছেন। রাজ্যের দিকে দিকে মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। খুন, ডাকাতি, জালিয়াতি বেড়েছে পৌনঃপুনিক হারে। বাঙ্গালি ২৬ হাজার শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। আরও ৩০/৩৫ হাজার শিক্ষক চাকরি হারাবার দিন গুনছেন। সরকারি হাসপাতাল আরজি করের চিকিৎসক অভয়া হত্যা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রনেতারা। সব মিলিয়ে এ সরকার এখন দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ভাণ্ডার শূন্য। সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকার ঋণ খোলা বাজারে। সামাজিক প্রকল্পের বাহানায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা অবৈজ্ঞানিকভাবে ‘ভাতা’ হিসেবে বিলি করে ভোট কিনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ। রাস্তা মেরামতি হয় না। শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ হয় না। একটার পর একটা সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভাতা দেবার পরও স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। গত ১৪ বছরে প্রায় ৭ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দৈন্য দেখলে চোখে জল আসে। মুখ্যমন্ত্রী তাই দেউলিয়া রাজনীতিতে ধামাচাপা দিতে নতুন ন্যারেটিভ নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন— যা হলো বাঙ্গালির অস্মিতা রক্ষা। যেন সব বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ রসাতলে। তিনি একা রক্ষাকর্ত্রী হয়ে বরাভয় দেবেন। বাঙ্গালি তাঁর ওপরই ছেড়ে দেবেন নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ।

পাঠককুল, একটু ভালো করে কান পাতুন— শুনতে পাচ্ছেন কোনো বাঙ্গালির আর্তনাদ যে তাঁর মান-সম্মান, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? একটু কান পাতুন, কোনো রাজ্য থেকে অভিযোগ পাচ্ছেন— পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী বাঙ্গালি চাকুরে বা ব্যবসায়ী সমাজ ‘সব গেল সব গেল’ বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হচ্ছেন? আমার আপনার ঘরের ছেলেপুলেরা যারা পড়াশোনা করে, ভালো রেজাল্ট করে অন্য রাজ্যে ভালো চাকরি করতে গেছে শুধুমাত্র জন্মভিটেয় বেঁচে থাকার রসদ নেই বলে, সামনে স্বপ্ন দেখানোর মতো কোনো সঠিক প্রতিষ্ঠান নেই বলে— তাদের কেউ কি আপনার কাছে অভিযোগ করেছে— তাদের ওপর ভিনরাজ্যের মানুষ অত্যাচার করছে? আমি নিশ্চিত— প্রশ্নটা শুনে আপনারা হাসছেন। আমি হাসছি। কারণ আমার পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় সকলেই রাজ্য ছেড়ে প্রবাসী। কেউ মুম্বাইয়ে, কেউ পুনেতে, কেউ বেঙ্গালুরুতে, কেউ গ্রেটার দিল্লিতে। তাদের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে তাদের কাছে যাই— ‘আপ বাঙ্গালি, হ্যায়— তো ইহাঁ কিঁউ? বঙ্গাল মেঁ যাইয়ে।’ এবং শুনতে

> **তৃণমূলি বাঙ্গালি অশিক্ষিত হতে পারে। অকৃতজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটি যে বাঙ্গালির সে তো অশিক্ষিত নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল’কে বুকে নিয়েই বাঙ্গালি অভয়যাত্রায় অংশ নেবে।**

> **মুখ্যমন্ত্রী কোনো দেবী নন, অভিভাবক নয়, ম্যাজিশিয়ান নন যে তিনি যা বলবেন তাই হবে। তিনি যা করবেন তাতেই হ্যাঁ বলতে হবে।**

হচ্ছে— ‘বঙ্গাল মেঁ মমতাজী ইয়ে সব কেয়া বতাতি? আপলোগকা তো জিনা হারাম কর দিয়া।’ লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। মনে পড়ে— এই রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মতো মানুষেদের কথা। তাঁদের হাতে রাজ্য দেউলিয়া হয়নি। অভয়ার মা, তমান্না র মাকে কেঁদে কেঁদে বলতে হয়নি— মুখ্যমন্ত্রী আপনি আমাদের মেয়েদের ফিরিয়ে দিন।

আসলে চিত্রটা কী? কেন এই মিথ্যা ন্যারেটিভ? প্রথম কারণ অবশ্যই ভোটব্যাংক নিয়ে আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন— বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাঁর দরকার। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি ভোটে ঘুণ ধরেছে। অতএব মুসলমান ভোটই তাঁর ভরসা। তাই বাঙ্গালির নাম করে তিনি বাংলাদেশি মুসলমানদের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন যাদের জাল পাসপোর্ট, জাল আধার কার্ড, জাল ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, ঝাড়খণ্ডে, বিহারে আর তারা দিব্যি রাতারাতি ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন। দিদির ভোটব্যাংক মানেই এই সব বাংলাদেশিরা, যারা ওইসব সরকারি নথির ভিত্তিতেই অন্য কোথাও গিয়ে স্থায়ী হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তাদের প্রথম আশ্রয়স্থল। অতএব বলতেই হবে, মানতেই হবে— মুখ্যমন্ত্রী হুংকার দিয়েছেন বাঙ্গালিকে রক্ষার জন্য নয়— বাংলাদেশি মুসলমানদের রক্ষার জন্য। যারা প্রতিদিন অরক্ষিত সীমান্ত পার করে তৃণমূলি নেতাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে— নগদ কড়ির বিনিময়ে পেয়ে যাচ্ছে নাগরিকত্বের নথি। মুখ্যমন্ত্রী জানেন, ২০২৬ ভোটে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করবে এই অনুপ্রবেশকারীরাই।

কিন্তু বাধ সেধেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন

ফ ঃ ৬

কমিশন। ২০০৩-এর পর এবছরই শুরু হয়েছে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। অর্থাৎ এবার ভূতুড়ে ভোটারদের রেহাই নেই। বিহারে ২১ লক্ষ ৬০ হাজার ভূতুড়ে ভোটার ধরা পড়তেই লালু-তনয় তেজস্বী যেমন ভোট বয়কটের হুংকার ছাড়তে শুরু করেছেন— এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীও আগেভাগে বাঙ্গালির জন্য 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান' গোছের হুংকার ছেড়ে বাজার গরম করছেন। কারণ এরাজ্যে ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যাটা বিহারের দ্বিগুণ হবে। দলের নেতা, আমচা চামচারাও তেমনি— সব শেয়ালের এক রা। দিদি ভৌ ভৌ করা মানে তারাও ভৌ ভৌ করবে একসঙ্গে; সত্য, মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়— এসব কিছু না ভেবেই। চুলোয় যাক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আগে তো নিজেদের পকেট ভরুক। বেকারের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ— তৃণমূলি দাদা-কাকা- ভাইপোরাই-বা করবেনটা কী? খেয়ে-পরে বাঁচতে তো হবে? কাটমানি, টেরর ভাতা, থ্রেট কালচার— এগুলোইতো ভরসা।

মুখ্যমন্ত্রীই এই ন্যারেটিভ সর্বৈব মিথ্যা, যেটা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু একইসঙ্গে একটা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে— বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলাদেশি মুসলমানদের আশকারা দিচ্ছেন— তাতে আগামী ২০২৬-এর নির্বাচনের পর এ রাজ্যের ভূমিপুত্র বাঙ্গালিরাই ভিটে আঁকড়ে থাকতে পারবেন কিনা, তাই নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি-সহ বহু জেলায় অচেনা মুখের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এরা কারা? জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে ঝা তকতকে নতুন আধার কার্ড। নামে হিন্দু। আচারে পোশাকে মুসলমান। দ্বিতীয় আশঙ্কা— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যা ন্যারেটিভ অন্য রাজ্যে কর্মক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত এবং বসবাসকারী নব প্রজন্মের ঝকঝকে মেধাসম্পন্ন বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েদের জীবন বিপন্ন করে তুলবে নাতো?

ভিনরাজ্যে বাঙ্গালিদের ওপর অত্যাচার চলছে— এই সম্পূর্ণ নির্জলা মিথ্যে অভিযোগ ভিন রাজ্যের মানুষ ও প্রশাসনকে উসকানি জোগাচ্ছে। তাঁদের মনে যদি বিন্দুমাত্র বাঙ্গালি বিদ্বেষ সুপ্ত অবস্থায় থেকেও থাকে— তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর এই উসকানি আগুনে ঘৃতাহুতির সমান হবে। কোনো সন্দেহ নেই, মুখ্যমন্ত্রীর 'জয় বাংলা' স্লোগানে আসলে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর নিবিড় রাজনৈতিক কৌশলের পরাকাষ্ঠা। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশি মুসলমানদের একটা বৃহত্তর অংশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঠিক কী করতে চাইছেন— পৃথক দেশ গঠন করতে? যদি তাই হয়, তাহলে এবার বাঙ্গালির ফোঁস করা দরকার। বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো অধিকার তাঁর নেই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। দেরি করলে বিপদ থেমে থাকবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে ছোবল বাঙ্গালিকে হানতে হবেই এবং আজই। পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির ছিল, আছে, থাকবে। বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নয়। বাঙ্গালি অন্য রাজ্যে ছিল, আছে, থাকবে। বাংলাদেশিরা নিপাত যাক। মুখ্যমন্ত্রী কোনো দেবী নন, অভিভাবক নয়, ম্যাজিশিয়ান নন যে তিনি যা বলবেন তাই হবে। তিনি যা করবেন তাতেই হ্যাঁ বলতে হবে।

তৃণমূলি বাঙ্গালি অশিক্ষিত হতে পারে। অকৃতজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটি যে বাঙ্গালির সে তো অশিক্ষিত নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'কে বুকে নিয়েই বাঙ্গালি অভয়যাত্রায় অংশ নেবে। সরিয়ে দেবে মায়াবিনীর ছড়িয়ে দেওয়া সমস্ত কালো পর্দা যা বহু বাঙ্গালিকে আজও অন্ধ করে রেখেছে। আমরা আশাবাদী— কালো মেঘ কাটবে। সামনেই ২০২৬। প্রস্তুত হন, শপথ নিন— দশ কোটি বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষার। বাঙ্গালির অস্মিতা রক্ষারও। এই শপথ আমাদের ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গের জন্য আশু প্রয়োজন। □

শোক সংবাদ

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সঞ্চালিকা মুক্তপ্রদা সরকার গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি রায়গঞ্জ দেবীনগর প্রমদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি কার্যকালে বেশ কয়েকবার তাঁর বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিক্ষা বর্গ পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিলেন। রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সমিতির অন্যতম সদস্যা ছিলেন তিনি। উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং উদয়পুর ও দেবীনগর অবৈতনিক ট্রাইবাল ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠাত্রী। চণ্ডীতলা বাজার এবং ডাকঘরের প্রতিষ্ঠাত্রী। দেবীনগর লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাত্রী। রায়গঞ্জ সারদা সেবা ট্রাস্টের সদস্যা ছিলেন।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সঞ্চালিকার দায়িত্বও পালন করেছেন। শেষ সময় পর্যন্ত সমিতির অভিভাবিকার দায়িত্বে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলা সঙ্ঘচালক গৌতম কুমার নিয়োগীর মাতৃদেবী মঞ্জুরি নিয়োগী গত ১৯ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স য়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম বিভাগ সেবা প্রমুখ অমর দে'র মাতৃদেবী চন্দ্রিকা দে গত ২৬ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

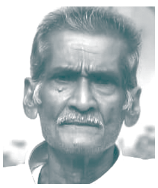

দক্ষিণ বীরভূম জেলা কার্যকারিণীর সদস্য এবং জেলা মুখ্য সড়ক প্রমুখ সমীরেন্দ্রনাথ পালের পিতৃদেব ভবানীপদ পাল গত ১৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

প্রতিটি ভারতবাসীর প্রতিটি পরামর্শ শুনতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রদীপ মারিক

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ যা সমগ্র বিশ্বকে 'সন্ত্রাসবাদ' নামক শব্দটাই উৎপাটিত করতে সহায়ক হবে। একমাত্র নরেন্দ্র মোদী হলেন বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তির দূত। মোদী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ভারত যুদ্ধের পক্ষে নয়, শান্তির পক্ষে। ভারত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই বিশ্বাস করে। সম্প্রতি ১২৩তম পর্বের মন কি বাত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৪০ কোটি দেশবাসীর প্রতিটি প্রশ্ন, দেশবাসীর প্রত্যেকটি কথা শুনে তা সমাধান করতে চান নরেন্দ্র মোদী।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে তিনি দেশের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরে বলেছেন, 'আপনাদের আমি দেশের এমন দুটি কৃতিত্ব অর্জনের বিষয়ে বলতে চাই যা আপনাদের গর্বে বুক ভরিয়ে তুলবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সাফল্যগুলির বিষয়ে আলোচনা করছে। হু অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইএলও অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন দেশের এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। প্রথম কৃতিত্বটি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। আপানাদের মধ্যে অনেকেই চোখের একটি অসুখের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন— ট্রাকোমা। এই রোগটি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়। একটা সময় দেশের বহু অংশে এই রোগের যথেষ্ট প্রকোপ ছিল। গুরুত্ব না দিলে এই রোগে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তিও চলে যেতে পারে। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ট্রাকোমাকে নির্মূল করব। আপনাদের এ কথা জানাতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ হু ভারতকে 'ট্রাকোমা ফ্রি' ঘোষণা করেছে।

যোগব্যায়ামকে জনআন্দোলনের রূপ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে চিঠি লিখে যোগ দিবস পালনে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। নিজ নিজ পঞ্চায়েত এলাকার নাগরিকদের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'যোগব্যায়াম শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের মানুষের জীবনে ইতিবাচক বদল এনেছে। এটা গর্বের বিষয়।' পঞ্চায়েত প্রধানদের পঞ্চায়েত ভবন, অঙ্গনওয়াড়ি, স্কুল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো জায়গায় যোগব্যায়াম অধিবেশন আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শিশু, যুবক, মহিলা, বয়স্ক সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাতে এই অধিবেশনে অংশ নেন, তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদবের দাবি, দেশজুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের বিপুল সাড়া মিলেছে। তিনি বলেছেন, 'তাঁর আন্তরিক আহ্বান আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে একটি সত্যিকারের জনআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছে। সারা ভারতের গ্রামগুলি যোগব্যায়ামকে জীবনের একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।' ১২৩তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদী বললেন, 'আপনারা সবাই এই সময় যোগের শক্তি এবং 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। এবারও ২১ জুন দেশ ও বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর উদ্‌যাপনে অংশ নিয়েছেন। আপনাদের মনে থাকবে, দশ বছর আগে এটা শুরু হয়েছিল। এখন দশ বছরে এই প্রক্রিয়া প্রত্যেক বছর আগের থেকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠছে। এটা এই ব্যাপারেরও ইঙ্গিত যে আরও বেশি-বেশি মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যোগকে গ্রহণ করছেন। আমরা এবার 'যোগ দিবস'-এর কতই না আকর্ষণীয় ছবি দেখেছি। বিশাখাপত্তনমের থেকেই আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য সামনে এসেছে, দু' হাজারেরও বেশি জনজাতি শিক্ষার্থী ১০৮ মিনিট ধরে ১০৮ বার সূর্য নমস্কার করেছে। ভেবে দেখুন,

কতটা অনুশাসন আর কতটা সমর্পণ মিশে ছিল এর সঙ্গে। আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজেও যোগাভ্যাসের চমৎকার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তেলেঙ্গানায় তিন হাজার দিব্যাঙ্গ বন্ধু একসঙ্গে যোগ শিবিরে অংশ নেয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে যোগ কীভাবে সশক্তিকরণের মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে।

২৫ জুন, ১৯৭৫ স্বৈরাচারী মানসিকতার নিদর্শন রেখেছিল তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার। একটা নিপীড়ক সরকারের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সংগ্রাম করলো লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেই সব সংগ্রামী মানুষদের চেতনাকে সম্মান জানাতেই সরকার 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালন করে আসছে। মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্র দিবস পালন প্রতিটি ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার চিরন্তন শিখা যা গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষাকে জীবন্ত রাখতে সাহায্য করে, ফলে কংগ্রেসের মতো স্বৈরাচারী শক্তিগুলিকে সেই ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত রাখে। ২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১ মাস ব্যাপী ভারতের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। এই জরুরি অবস্থার পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় সংবিধানে ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। এই আদেশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়, যার ফলে নির্বাচন বাতিল করা এবং নাগরিক অধিকার স্থগিত করা সম্ভব হয়। জরুরি অবস্থার অধিকাংশ সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে নেতা বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে ১ লক্ষের বেশি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে আটক করা হয়। জরুরি অবস্থা জারির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, যা ভারতের রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন এবং জুলাই থেকে আগস্ট ১৯৭৫-এর মধ্যে মন্ত্রীসভা ও সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, ভারতের উপর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে বিপদ সংকেত ছিল। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার পরামর্শে, 'যুদ্ধ বা বহিরাগত আগ্রাসন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ' দ্বারা ভারত বা দেশের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাই বলেছেন যে, সংবিধান বদল করার বীজ পুঁতেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেই কাজটাই করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। রক্তের গন্ধ পেয়ে সংবিধানের সাহায্য নিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সংবিধানকে কাজে লাগিয়ে আদালতের ক্ষমতাও ছেঁটে ফেলেছিলেন তিনি। টানা ৬০ বছরের শাসনকালে ৭৫ বার সংবিধান বদল করেছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বললেন, কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্রের গলা চেপে ধরে দেশটাকে জেলখানায় পরিণত করেছিল। টানা ২ বছর মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস।

সংবিধান তৈরির ২৫ বছরের মধ্যে তা টুকরো করে ফেলেছিল কংগ্রেস। সংবাদমাধ্যমের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস সেই দাগ কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না। জরুরি অবস্থা আরোপের ৫০তম বার্ষিকীতে ২৫ জুন দিনটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালনের জন্য কেন্দ্র সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দিয়েছে। পরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মশাল মিছিল, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, এছাড়াও স্কুল ও কলেজে গণ-প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবদের কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছে যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক নীতিশাস্ত্রের প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এই কর্মসূচি ২৫ জুন ২০২৫ থেকে ২৫ জুন ২০২৬ বছরব্যাপী পর্যন্ত চলবে। মূল আকর্ষণ হবে একটি মশাল এবং ই-মশাল যাত্রা, যেখানে ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে দিল্লি থেকে 'গণতন্ত্রের চেতনার' প্রতীক হিসেবে ছ'টি মশাল যাত্রা শুরু হবে। মশাল শোভাযাত্রাটি ২১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কর্তব্য পথে শেষ হবে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকবেন। অতিরিক্ত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে প্রদর্শনী, সেমিনার এবং স্কুল ও কলেজগুলিতে প্রচার।

কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য রাজ্যগুলিকে নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। ২৫ জুন জনসাধারণের জন্য কর্মসূচির প্রকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় পতাকা এবং 'ভারত গণতন্ত্রের মাতা', 'গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক' এবং 'গণতন্ত্রের চেতনায় সেঙ্গোলকে স্যালুট' স্লোগান সংবলিত অনুমোদিত প্ল্যাকার্ড বহন করতে পারবেন। ১২৩তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদীজী বললেন, 'দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে কিছুদিন আগেই। আমরা দেশবাসী সংবিধান হত্যা দিবস পালন করেছি। আমাদের সর্বদা ওই সমস্ত মানুষকে মনে রাখা উচিত, যারা সাহসের সঙ্গে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করেছিলেন। এর থেকে আমাদের সংবিধানকে সর্বদা শক্তিশালী রাখার জন্য নিরন্তর সজাগ থাকার অনুপ্রেরণা পাই।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেঘালয়ের মানুষদের এরি সিল্ক GI ট্যাগ পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি, আপনারা অবশ্যই এরি সিল্ক দিয়ে তৈরি পোশাক তৈরি করার চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি খাদি, handloom handicraft, Vocal for Local, এই বিষয়গুলোও আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। যদি গ্রাহকরা কেবল ভারতে তৈরি সামগ্রী কেনেন, আর ব্যবসায়ীরা কেবল ভারতে তৈরি জিনিসই বিক্রি করেন, তাহলে 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে' নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে।'

মাতৃশক্তি যে দেশবাসীর শক্তি তা বার বার বোঝাতে চেয়েছেন মোদী। ১২৩তম মন কি বাত অনুষ্ঠানের তিনি বলেছেন, 'Women led development-এর মন্ত্র ভারতের নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মা, বোন ও কন্যারা কেবল নিজেদের জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য নতুন দিশা তৈরি করছেন। তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলমের মহিলাদের সাফল্যের কথা জানলে আপনাদেরও ভালো লাগবে। এই মহিলারা একসময় ক্ষেতমজুর ছিলেন। তাঁরা রুজি রুটির জোগাড় করার জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতেন। আর সেই মহিলারাই আজ মিলেটস শ্রী অন্ন থেকে বিস্কুট তৈরি করছেন। 'ভদ্রাদ্রী মিলেট ম্যাজিক' নামে এই বিস্কুটগুলি হায়দরাবাদ থেকে লন্ডনে যাচ্ছে। ভদ্রাচলমের এই মহিলারা সেলফ হেল্প গ্রুপে যোগদান করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'এই মাসে আমরা সকলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করেছি। আপনাদের হাজার হাজার চিঠি পেয়েছি। কিছু ব্যক্তি নিজেদের আশেপাশের এমন বিশেষ মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা নিজেরা একাই পরিবেশে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন আর তারপর তাদের সঙ্গে পুরো সমাজ যুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকের এই যোগদান আমাদের ধরিত্রির জন্য এক বিরাট শক্তি হয়ে উঠেছে। পুনের রমেশ খারমালেজী, তাঁর কাজের কথা শুনে আপনারাও অনুপ্রাণিত হবেন। যখন সপ্তাহের

শেষে সবাই বিশ্রাম নেন, তখন রমেশজী ও তাঁর পরিবার কোদাল ও বেলচা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। জানেন কোথায়? জুন্নার পাহাড়ের দিকে। রোদের তেজ হোক বা খাড়াই পথ, তাঁদের চলা কখনো রুদ্ধ হয় না। তাঁরা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করেন, জল সংরক্ষণের জন্য ট্রেঞ্চ খনন করেন এবং বীজ বপন করেন। মাত্র দু-মাসে তিনি ৭০টি ট্রেঞ্চ খনন করে ফেলেছেন। রমেশজী অনেক ছোটো ছোটো জলাশয় তৈরি করেছেন, শতাধিক গাছও লাগিয়েছেন। তিনি একটি 'অক্সিজেন পার্ক'-এর কাজও শুরু করেছেন। এর ফলস্বরূপ, এখন সেখানে আবার পাখিরা ফিরে আসছে এবং বন্য জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে। মন কি বাত অনুষ্ঠানের অর্থই হৃদয় থেকে কথা বলা অর্থাৎ মনের কথা।

২৫ জুন, ১৯৭৫ স্বৈরাচারী মানসিকতার নিদর্শন রেখেছিল তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার। একটা নিপীড়ক সরকারের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সংগ্রাম করলো লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেই সব সংগ্রামী মানুষদের চেতনাকে সম্মান জানাতেই সরকার 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালন করে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আয়োজিত একটি ভারতীয় রেডিয়ো অনুষ্ঠান যেখান থেকেই তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো, ডিডি ন্যাশনাল এবং ডিডি নিউজে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ৩ অক্টোবর ২০১৪ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর এবং ধারণাগুলি ভারতের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন, গ্রামীণ এবং কম উন্নত অঞ্চলে এখনো টেলিভিশন সংযোগ পাওয়া যায় না, তাই এর বিস্তৃত প্রসারের কারণে রেডিয়োকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। মোট ভারতীয় জনসংখ্যার আনুমানিক ৯০ শতাংশ এই মাধ্যমে যোগাযোগযোগ্য। দূরদর্শনের ডাইরেক্ট টু হোম (DTH) পরিষেবা বিনামূল্যে ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে ২০ মিনিটের পর্বের ফিড টেলিভিশন এবং রেডিয়ো চ্যানেলগুলিতে রিলে করে। প্রথম মন কি বাত অনুষ্ঠানটি বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে ৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সম্প্রচারিত হয়েছিল এবং তারপরে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি আপামর ভারতবাসী গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালে মুম্বই এবং চেন্নাই-সহ ৬টি ভারতীয় শহরে অনুষ্ঠানটির সাফল্যের অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে প্রায় ৬৬.৭ শতাংশ জনগণ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে আগ্রহী ছিলেন এবং এটিকে কার্যকর বলে মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা, মন কি বাতের চতুর্থ পর্বের অংশ ছিলেন, যা ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রচারিত হয়েছিল। ওবামা গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিতে ভারতে এসেছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে, লতা মঙ্গেশকর অনুষ্ঠানের একজন বিশেষ অতিথি ছিলেন। মোদীজীর সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য অনুষ্ঠানে ডাক্তার ও শিক্ষকদের মতো অতিথিদের ডাকা হয়েছে। ২০২১ সালের জুলাই মাসে রাজ্যসভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর এক বিবৃতি অনুসারে, এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো 'দৈনন্দিন সরকারের কাজের বিষয়গুলিতে নাগরিকদের সঙ্গে একটি সংলাপ স্থাপন করা'। মন কি বাত অনুষ্ঠানটি অরাজনৈতিক এবং ভারতের প্রথম সমৃদ্ধ রেডিয়ো অনুষ্ঠান। মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদী যুব সমাজকে মনোনিবেশ করার জন্য পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কগুলো বলতে গিয়ে শচীন তেন্ডুলকর, দাবা চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক নেতা মোরারি বাপুর মতো শ্রোতাদের জন্য এই বিষয়ে তাঁদের মতামত ভাগ করে নেন। মোদীজী শ্রীনিবাস রামানুজম এবং জে কে রাউলিঙের উদাহরণও তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন শিক্ষার্থীদের যে, 'আমি কত নম্বর পেয়েছি?' নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, বরং জীবনের বৃহত্তর বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত।

ছোটোরা এখন শহরে চড়াই পাখি দেখতেই পায় না। ক্রমশ কমে আসছে চড়াইয়ের সংখ্যা। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, চড়াইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এবার সরকারের তরফে নজিরবিহীন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চড়াইয়ের এই ক্রম অবলুপ্তির কারণ হিসেবে নগরায়নকে দায়ী করেন তিনি। 'মন কি বাত'-এ নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ছোটোবেলায় ছাদে উঠলেই কত চড়াই পাখি দেখতে পেতাম। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এই পাখির অন্যান্য প্রাণীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজকাল তো শহরে চড়াই প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। এই প্রজন্মের অনেক বাচ্চা পাখিটি শুধু ছবি বা ভিডিয়োতেই দেখেছে। ছোট্ট, মিষ্টি এই পাখির পুনরুজ্জীবনে একেবারে অভিনব প্রচেষ্টা শুরু করা হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে চেন্নাইয়ের কুদুগাল ট্রাস্টের কথা উল্লেখ করেন তিনি। প্রতিষ্ঠানটি এক অনন্য উপায়ে মাত্র ৪ বছরেই চড়াইয়ের সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ওই সংস্থা বাচ্চাদের চড়াই পাখির জন্য ছোট্ট কাঠের বাড়ি বানাতে শিখিয়েছিল। ৪ বছরেই তারা প্রায় ১০ হাজার কাঠের বাসা বানিয়ে ফেলে। বাসার পাখিদের জল-খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। স্কুল থেকেই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছিল, প্রতিদিনের জীবনে চড়াই পাখির উপযোগিতা কতখানি। একইসঙ্গে কর্ণাটকের 'আর্লি বার্ড' প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন মোদী, যার মাধ্যমে শিশুদের প্রকৃতি ও পাখপাখালি সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানো হয়।

সম্প্রতি সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এই স্বীকৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি জানান, ভারতের সঙ্গে সাইপ্রাসের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে এই সম্মানকে দেখছেন তিনি। সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলিডিসের হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন তিনি। সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য মাকারিওস ৩'। সাইপ্রাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট মাকারিওস ৩-এর নামে নামাঙ্কিত এই সম্মান। সেই সম্মান গ্রহণের পর মোদীজী বলেন, 'এটা শুধু আমার নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসী এই সম্মানের দাবিদার। ভারতীয়দের সক্ষমতা, ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং বসুধৈব কুটুম্বকম দর্শনের সম্মান।' মোদীজী এই সম্মানকে দুই দেশের বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। তাঁর মতে, 'এই সম্মান দুই দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতীক।' দেশবাসীর বিশ্বাস তাদের সঙ্গে আছেন ১৪০ কোটি ভারতবাসীর মনের কথা জানতে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারেন একমাত্র বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী। □

বাঙ্গালির সত্য, বাঙ্গালির মিথ্যা

বাঙ্গালিপ্রেমীষু দিদি,

বাঙ্গালির জন্য আপনি যে ভাবে কান্নাকাটি করছেন তাতে সত্যিই আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যে বাঙ্গালিকে আপনি ১৪ বছর প্রায় বনবাসে রেখে দিয়েছেন, আপনার জ্বালায় কত বাঙ্গালি মেধাবী ও কুশলী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তবু আপনার চোখে জল।

সরি দিদি, ভুল করে ফেললাম। সবার চোখে তো জল আসে না। কারও কারও পানিও আসে। সবাই নেমন্তন্ন করে খাওয়ায় না। কেউ কেউ দাওয়াত দেন। তবুও তাঁরা বাঙ্গালি। আমি জানি, আপনি সেই গোত্রের। তাই আপনি মনে করেন, হতে পারে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী, তা বলে কি বাঙ্গালি নয়? তাই তো আপনার এই বাংলা বাঙ্গালি করে কান্না, চোখ দিয়ে পানি বার হচ্ছে?

আমার কটা প্রশ্ন আছে দিদি। আপনি রাগ করবেন না ধরে নিয়েই প্রশ্নটা করে ফেলছি। দিদি আমাদের রাজ্যের শাসক দলের নাম মানে আপনার দলের নাম কী? তৃণমূল কংগ্রেস। সংক্ষেপে এআইটিসি। মাঝে তৃণমূল শব্দটি বাদে সবটাই ইংরেজি। সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস হতে পারত তো। জাতীয় তৃণমূল হতে পারত। সব চেয়ে ভালো হতো বঙ্গীয় তৃণমূল কংগ্রেস কারণ, যতই সর্বভারতীয় ভাবুন আসলে দলটা তো শুধুই এই রাজ্যের। তবু দলের নামটা ইংরেজিতেই মূলত। আসলে দিদি আপনি এটা ভালোই জানেন যে আপনার ভোটারদের একটা বড়ো অংশ জলকে পানি বলেন, দাওয়াত দেন।

কিন্তু দিদি, আমার অনেক বন্ধু, আত্মীয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে থাকেন। আপনার পরিবারের লোকেরাও তো থাকেন। তাঁদের অনেকেই বাংলায় লেখাপড়ার ভালো সুযোগ নেই, ভালো কাজ নেই বলেই ভিন রাজ্যে থাকেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বিপদে পড়েছেন কি? পড়েননি। কারণ, তাঁরা বাংলায় কথা বললেও পানি, দাওয়াত বলেন না। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই কাকে বঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর করলেন? শাহরুখ খানকে। কেন? পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কীসের যোগ? কারণ, আপনার ভোটব্যাংকের সঙ্গে যোগ ছিল।

কেকেআর ক্রিকেট দলের মালিক বলেও কিন্তু নয়। নামেই কলকাতা আছে আর তা নিয়েই তো বাঙ্গালি নাচানাচি করে। কিন্তু সেই টিমে ক'জন বাঙ্গালি রয়েছেন? লাস্ট আইপিএল-এ একজনও ছিলেন না। কলকাতার ফুটবল ক্লাবগুলো তো সবই তৃণমূল নেতাদের দখলে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানে হাতে গোনা কয়েকজন বাঙ্গালি। দুই ক্লাব মিলিয়ে আইএসএল দলে বড়ো জোর জনা চারেক। ভাবা যায়? বাঙ্গালি বাঙ্গালি করে চোখের পানি কি ফেলা যায়? হ্যাঁ ফেলা যায়। আমার দিদি যখন ফেলছেন তখন ফেলা যায়।

তবে দিদি লোকেরা নানা প্রশ্ন তুলছে জানেন। কে ডি সিং বাঙ্গালি ছিলেন নাকি! তিনি তো তৃণমূলের কেউকেটা ছিলেন। লোকসভায় শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠানরা কোথাকার বাঙ্গালি?

আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ ছাড়া কোনো বাঙ্গালিকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেননি। আইপিএস সোমেন মিত্র দু'বার হলেও সেটা নির্বাচন কমিশনের চাপে। বাকি গোয়েল, ভার্মা, শর্মারা আলো করে রয়েছেন।

রাজ্যসভায় গোয়ার লুইজিনহো ফালেইরো, পদবি দেখে বাঙ্গালি মনে হলেও সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেবকেও কি বাঙ্গালি বলা যাবে নাকি! সাকেত গোখলেও তো ভিন রাজ্যের লোক।

প্রশ্নের শেষ নেই দিদি। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ ছাড়া কোনো বাঙ্গালিকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেননি। আইপিএস সোমেন মিত্র দু'বার হলেও সেটা নির্বাচন কমিশনের চাপে। বাকি গোয়েল, ভার্মা, শর্মারা আলো করে রয়েছেন। রাজ্য পুলিশের প্রধান মানে ডিজি হিসেবে ১৪ বছরে শুধু একবার বাঙ্গালি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে নিয়োগ দিয়েছিলেন আপনি। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। নবান্নে কজন দু'জন আমলা বাঙ্গালি সুব্রত গুপ্ত এবং অত্রি ভট্টাচার্যকে টপকে অবাঙ্গালি মনোজ পন্থকে মুখ্যসচিব করেছেন মমতা।

বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কেউ আর পড়তেই চায় না। সব ইংরেজি। আপনার পরিবারেও তাই। অভিষেকের লেখাপড়াই তো নবনালন্দা হাই স্কুল এবং পরে এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশন হাইস্কুলে। এর পরে বিবিএ এবং এমবিএ করেন দিল্লির সংস্থায়। এই প্রজন্মের তৃণমূল নেতাদের সন্তানেরা কে কোথায় পড়েন খোঁজ নিয়ে দেখুন।

বাংলা ভাষায় অবশ্য আপনার বড়ো অবদান রয়েছে। যেমন শুভেচ্ছার বদলে শুভনন্দন। যার মানে দাঁড়ায় শুভর ছেলে। আবার আবাসনের নাম দিয়েছেন নিজন্ন ও সুজন্ন। কোনো অভিধানে এমন অন্নের খোঁজ পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন আগে নবান্নের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন উপান্ন। সেটার মানে আছে। চালের মতো মানে খুদ বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জন্মের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকা পয়লা বৈশাখ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

কীসের ভয়ে বাঙ্গালি উন্মাদনার বিষ ছড়াচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি?

জুজু যদি ধরে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শহিদ দিবস’ বখামির দিবসে পর্যবসিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী সেটাই ব্যবহার করছেন। ভুয়ো ভোটার সরাতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ তাঁর সামনে বড়ো বিপদ। ধারণা করা হচ্ছে যে, এই রাজ্যে এক কোটির বেশি ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এরাই হলো তৃণমূলনেত্রীর ভোটব্যাংক। তৃণমূলের উপদেষ্টা সংস্থার এক কর্মী এই প্রতিবেদককে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে ১৯.৫ থেকে ২১.৭ শতাংশ মুসলমান ভোট ৩৩ শতাংশ হয়ে যায়। বিহারের পর এবার এ রাজ্যেও আগস্ট মাস থেকে ভুয়ো ভোটরা ধরার কাজ শুরু হবে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূলের থেকে বিজেপির ফারাক মাত্র ৪২ লক্ষ ভোট। সবধরনের শস্তা আবেগকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আগামী বছরের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন উতরাতে চাইছেন। তাই অহেতুক ও অযাচিত বাঙ্গালি আবেগ তৈরি করছেন। একুশে জুলাইয়ে রেউড়ি দিয়ে মিথ্যা লোক জড়ো করা হলো তার নজর ঘোরানোর খেলা। তৃণমূলনেত্রী তার বিপদ বুঝতে পারলেও তার সঙ্গী-সাথীরা তা মানতে নারাজ। এমন কোনো তৃণমূল নেতা পাওয়া যাবে না যে বিশ্বাস করে মমতা ব্যানার্জি হারতে পারেন আর বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়তে পারে।

এক চটুল বাঙ্গালি অভিনেতার সিনেমার গান বাজিয়ে তৃণমূলের ‘শহিদ মঞ্চে’ হাস্যকর পাগলু নাচ হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন সেদিনই ১৯৯৩ সালে ১৩ জন মৃত যুব কংগ্রেস কর্মীর আবার নতুন করে মৃত্যু হলো। তৃণমূলনেত্রীর একুশে জুলাই দিবস পালনকে অনেকেই অনধিকার চর্চা বলে মনে করেন। এই তৃণমূলনেত্রী তখন কংগ্রেসে ছিলেন। একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে এক অসামাজিকতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। মানুষের ঢল দেখে বোঝা দায় যে তার কতটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং কতটা জোর করে আর ভয় দেখিয়ে, কিংবা রেউড়ি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ব্রিগেডে সপ্তম বামফ্রন্টের শেষ সভা দেখে একবারের জন্য মনে হয়নি বিদেশি সিপিএম রাজ্য থেকে ধুয়ে-মুছে যাবে। আত্মজীবনীতে তৃণমূলনেত্রী লিখেছিলেন, একুশে জুলাই ‘দেনা পাওনার দিন নয়’। ক্ষমতা আসার ১৫ বছরের মধ্যেই তার তৈরি দিবস যে দুষ্কৃতী আর সমাজবিরোধীদের চারণক্ষেত্র হয়ে উঠবে তা হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই নীরব রয়েছেন। যাদের সঙ্গে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি বিদেশি সিপিএম তাড়িয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই আজ নেই। নতুনরা প্রবৃত্তির দাস। সম্মান আর পিঠ বাঁচাতে আত্মজীবনীকে তাই নিঃশব্দে ভুল প্রমাণ করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

একুশে জুলাইয়ের নারকীয় গুলি চালনার ঘটনায় বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই ঘটনার হোতা তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব মণীশ গুপ্ত এখন তৃণমূল নেতা। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে এই প্রতিবেদকের ধারণা এই ঘটনার পিছনে তার চাইতেও গভীর কিছু রয়েছে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, ওই ঘটনায় পুলিশ কিন্তু তৎকালীন যুব কংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ করেনি। সে কারণ আজও রহস্যে ঘেরা! তারপরেও ১৮ বছরের মধ্যে বিদেশি সিপিএম বা বামফ্রন্ট সরকার কোনোদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ হেফাজতে নেয়নি বা জেল খাটায়নি। যেকোনো চটুল গান ব্যবহার করেই পশ্চিমঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। জুজু যদি ধরে বা থাবা না মারে ইত্যাদি আবোল তাবোল কথা বসিয়ে একটি চটুল, নিরর্থক ও অপ্রকৃতিস্থদের গান একসময় রাজ্যে সাড়া ফেলেছিল। যারা ওই গান পরিবেশন করতেন, তাদের কয়েকজন এখন তৃণমূল দলে ভিড়ে তাকেই জুজু বানিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তৃণমূলনেত্রীর সর্বশেষ চটুলপনা হলো বাঙ্গালি আবেগকে অহেতুর উসকে দিয়ে বেআইনি মুসলমান আর রোহিঙ্গাদের ঘরের ভোটার বানানো।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যা ভাবেন বা বলেন, তা করেন না। তাই ২০০৫ সালের অনুপ্রবেশবিরোধী দণ্ড ফেলে এখন তিনি অনুপ্রবেশধর্মী ঝান্ডা ধরেছেন। সেই সময়ের ‘সিরিয়াস অ্যান্ড ডিজাসস্ট্রাস ম্যাটার’ এখন স্বাভাবিক ঘটনা! তাই মিথ্যা ন্যায়ের দণ্ডকে সামনে রেখে রাজনৈতিক লোলুপতায় তার জাতি- ধর্মকেও বিসর্জন দিতে পিছপা নন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর মূল উদ্দেশ্য বাঙ্গালি ভাবাবেগকে উন্মাদনার পর্যায়ে তুলে নিয়ে এসে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যাতে বাঙ্গালি ভীত হয়ে রাজ্যের বাইরে কোথাও না যায়; বিজেপিকে অবাঙ্গালিদের দল বলে মিথ্যা পরিচয়ে দাগিয়ে দিয়ে তাদের যাতে পথে বসানো যায়। বাঙ্গালির আবেগপ্রবণতাকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের চক্রান্তে কিছু অকিঞ্চিৎকর লোকজন ঢুকেছে। তাদের কেউ পুরোনো বামপন্থী। একুশে জুলাই এখন যেমন পাওনার দিবস, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর রেখে যাওয়া দেনা চোকাতে আগামী মাসেই আসছে নির্বাচন কমিশন জুজুও।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ডেমোগ্রাফিক ওয়ারফেয়ার এক নীরব যুদ্ধ চলছে পশ্চিমবঙ্গে

বিপ্লব বিকাশ

আমরা যুদ্ধ বলতে বুঝি বন্দুক, বোমা, সেনাবাহিনী আর সীমান্ত। কিন্তু একটা যুদ্ধ আজ আমাদের চোখের সামনেই চলছে, অথচ আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। এই যুদ্ধ চলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে; ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, জন্মহার বৃদ্ধি, অনুপ্রবেশ আর রাজনৈতিক তোষণের কৌশলে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Demographic Warfare, অর্থাৎ জনঘনত্বকে হাতিয়ার করে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরের দখল নেওয়ার যুদ্ধ। এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতা আজ সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

বাম শাসনকাল থেকেই বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ভারতে বসবাস করছে। তারা এখন আধার কার্ড, রেশন কার্ড, এমনকী ভোটার আইডি নিয়ে আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।

এই পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রেশন, ঘর, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নিরাপত্তা পর্যন্ত সবকিছুই সহজলভ্য করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সেকুলার দল ও তাদের পরিচালিত সরকার। তারা ধীরে ধীরে ভোটার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এবং সেই ভোটে গঠিত হচ্ছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল ও রাজ্য সরকারের শক্তি হচ্ছে সেই ভোটাররা। এই চক্রটাই হলো ডেমোগ্রাফিক ওয়ারফেয়ার, যার মাধ্যমে একটি রাজ্যের জনবিন্যাসকে বদলে দেওয়া হচ্ছে সাঙ্ঘাতিকভাবে। এটা এমন এক যুদ্ধ, যেখানে বন্দুকের দরকার নেই। দরকার জন্মহার বৃদ্ধি, দরকার ভোটার তালিকায় উপস্থিতি, দরকার প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করা, যাদের পরিচয় বা নাগরিকত্ব হবে ভারতীয়, কিন্তু নৈতিকভাবে তারা দেশের শত্রু হিসেবে গড়ে উঠবে।

ইয়াসের আরাফাত একবার বলেছিলেন, 'The Womb of the Palestinian Women is the strongest weapon against Zionism' অর্থাৎ গর্ভই একটি যুদ্ধের অস্ত্র। এই কথার বাস্তবতা আজ পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার জন্মহার এখনও হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS) অনুযায়ী, গড়ে একজন মুসলমান মায়ের সন্তান সংখ্যা ২.৩৬-এর কাছাকাছি, যেখানে হিন্দু পরিবারে তা ১.৭-এর নীচে। এই অসামঞ্জস্য কয়েক দশকে এক ভয়ংকর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ পরগনা কিছু অঞ্চলে আজ হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন, অনেকে নিজেদের এলাকাতেই অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন।

এই অবস্থা সৃষ্টিতে শুধু অনুপ্রবেশ নয়, ভোটভিখারি রাজনীতিকদেরও বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এই রাজনৈতিক দলগুলি অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের ভোটব্যাংক বানিয়ে রেখেছে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে, তাকে বলা হয় 'সাম্প্রদায়িক', মুসলমান বিরোধী'। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের একটা বড়ো অংশও এই সত্যকে চাপা দিতে ব্যস্ত। কিছু নামিদামি সাংবাদিক যখন অবৈধ নাগরিকত্ব, সীমান্ত সুরক্ষা বা জনসংখ্যা নিয়ে কথা বলেন না, তখন বোঝা যায় তারা সত্যিটা দেখাতে চান না। বরং তারা মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা ইত্যাদির কথা বলে এক প্রকার বিভ্রান্তিকর আবেগ তৈরি করেন। ফলে, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তোলার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন।

আর এখানেই এই যুদ্ধ সফল। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বুঝতে হবে যে, এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দখলদারিত্ব। আজকের পশ্চিমবঙ্গ 'বাংলা' নামে যেন 'ইসলামিক পরিচয়' বহন করছে।

এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী এক-দু' দশকে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এটা আর কোনো আশঙ্কা নয়, এটা এক ভয়ংকর বাস্তবতা। এর জন্য দায়ী আমরা হিন্দুরাই, আমাদের নীরবতা, আমাদের ভয়, আমাদের উদাসীনতা। কেউ প্রশ্ন করলে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করলে তার নামে মামলা হচ্ছে। আর বাকি সবাই এই নীরব। আগ্রাসন দেখেও চুপ করে আছেন।

সত্যি বলতে কী, এখন প্রশ্ন তোলাই হলো প্রকৃত দেশপ্রেম। যদি আমরা এখন না বলি, 'ভোটার তালিকায় কারা?' 'এদের নাগরিকত্ব কে দিল?' 'এই অনুপ্রবেশকারীরা কোন রাজনৈতিক শক্তিকে সাহায্য করছে?' তাহলে পরে আর সুযোগ থাকবে না বলার। কারণ, তখন হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য থাকবে না, অবস্থান থাকবে না, পরিচয় থাকবে না। এটা হবে এমন এক জায়গা, যেখানে হিন্দুরা থেকেও থাকবেন না, বলতেও পারবেন না, লিখতেও পারবেন না। তখন হিন্দুরা বুঝতে পারবে, বন্দুক ছাড়াও যুদ্ধ কত ভয়ংকর হতে পারে। কিন্তু তখন বুঝেও আর কিছু করতে পারা যাবে না। □